সওমের উদ্দেশ্য

উপবাস নয় আত্মসংযম

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

সওমের উদ্দেশ্য

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

হেযবুত তওহীদ

বাড়ি - ০৩, রোড-২০/এ, সেক্টর-১৪, উত্তরা, ঢাকা।

সওমের উদ্দেশ্য
হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম
প্রকাশনায়
তওহীদ প্রকাশন
১৩৯/১ তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
০১৭১১-০০৫০২৫, ০১৭১১৫৭১৫৮১
০১৬৮৬-৪৬২১৭৫, ০১৬৭০-১৭৪৬৪৩

অনুলিখন: রিয়াদুল হাসান ও আসাদ আলী
গ্রাফিক্স লেআউট ও কম্পোজিশন:
সোহাইব আল বান্না ও রিয়াদুল হাসান

১ম প্রকাশ: ৩০ জুন ২০১৬
২য় মুদ্রণ: ১ মে ২০১৯
৩য় মুদ্রণ: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

ফ্রি ডাউনলোড: www.hezbuttawheed.org
ইমেইল: tawheedpublication@gmail.com

সোশ্যাল মিডিয়া:
Hossain Mohammad Salim | facebook.com/emamht
Hezbut Tawheed | facebook.com/HezbutTawheedOfficial
www.youtube.com/hezbuttawheed
ISBN: 978-984-8912-40-9

মূল্য: ৬০.০০ টাকা

সূচিপত্র

১. রোজা নয়, সওম.....৫
২. সংক্ষেপে ইসলামের প্রকৃত আকিদা.....৬
৩. মানবজীবন ও ইসলামের সম্পর্ক..... ১১
৪. সওম কার জন্য?.....১৭
৫. সওমের উদ্দেশ্য কী? ১৮
৬. তাকওয়া অর্থ কী? ১৮
৭. মো'মেন জীবনের লক্ষ্য কী?.....১৯
৮. সওম কী শিক্ষা দেবে? ২০
৯. সওমের উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি উদাহরণ..... ২১
১০. সওম কখন উপোস থাকা হবে?.....২৫
১১. সমাজে সওমের প্রভাব ২৮
১২. দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রুখতে পারে সওম! কীভাবে?.....৩২
১৩. হাদিসের আলোকে ব্যর্থ সওম.....৩৭
১৪. সওম নিয়ে পণ্ডিতদের চুলচেরা বিশ্লেষণ ও বাড়াবাড়ি ৩৮
১৫. সওমের কাফফারা আমাদের কী শিক্ষা দেয় ৪৩
১৬. সওমের গুরুত্বের ওলট পালট.....৪৫
১৭. তারাবির সালাতের গুরুত্ব কতটুকু?.....৪৭
১৮. কোর'আন খতম ও তারাবিকেন্দ্রিক ধর্মব্যবসা.....৫০
১৯. সওম সম্পর্কে কোর'আন ৫৫
২০. হেদায়াহ ও তাকওয়ার পার্থক্য কী? ৬০
২১. সওম সংক্রান্ত জরুরি মাসলা-মাসায়েল ৬৫
২২. সওম শরীরের জাকাত ৭৩
২৩. রসুলাল্লাহর (সা.) ঈদ কেমন ছিল?..... ৭৬

আমাদের অন্যান্য বইসমূহ

১. ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা
২. ইসলামের প্রকৃত সালাহ্
৩. The Lost Islam
৪. যামানার এমামের পক্ষ থেকে মহাসত্যের আহ্বান
৫. দাজ্জাল? ইহুদি-খ্রিস্টান 'সভ্যতা'! (বাংলা ও ইংরেজি)
৬. হেযবুত তওহীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
৭. জেহাদ, কিতাল ও সন্ত্রাস
৮. এ জাতির পায়ে লুটিয়ে পড়বে বিশ্ব (পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ সঙ্কলন)
৯. আসুন-সিস্টেমটাকেই পাল্টাই
১০. আল্লাহর মো'জেজা: হেযবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা
১১. বাঘ-বন-বন্দুক (শিকারের বাস্তব অভিজ্ঞতার বিবরণ)
১২. বিশ্বনবী মোহাম্মদ (দ.) এর ভাষণ
১৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি যামানার এমামের পত্রাবলি
১৪. ইসলাম শুধু নাম থাকবে
১৫. বর্তমানের বিকৃত সুফিবাদ
১৬. চলমান সঙ্কট নিরসনে হেযবুত তওহীদের প্রস্তাবনা
১৭. জোরপূর্বক শ্রমব্যবস্থাই দাসত্ব
১৮. দান: ইসলামের অর্থনীতির চালিকাশক্তি
১৯. ধর্মব্যবসার ফাঁদে
২০. হলি আর্টিজানের পর...
২১. সওমের উদ্দেশ্য
২২. চলমান সংকট নিরসনে আদর্শিক লড়াইয়ের অপরিহার্যতা
২৩. আক্রান্ত দেশ আক্রান্ত ইসলাম
২৪. সম্মানিত আলেমদের প্রতি
২৫. তওহীদ জান্নাতের চাবি
২৬. শোষণের হাতিয়ার (DIVIDE & RULE -শোষণের হাতিয়ার)
২৭. পাশ্চাত্যের মানসিক দাসত্ব দূরীকরণে গণমাধ্যমের করণীয়
২৮. সকল ধর্মের মর্মকথা সবার ঊর্ধ্বে মানবতা
২৯. পন্নী পরিবারের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস
৩০. জঙ্গিবাদ সঙ্কট: উত্তরণের একমাত্র পথ
৩১. পর্দাপ্রথার গোড়ার কথা
৩২. শ্রেণিহীন সমাজ, সাম্যবাদ ও প্রকৃত ইসলাম

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রোজা নয়, সওম

এ উপমহাদেশে সওম বা সিয়ামের বদলে 'রোজা' শব্দটা ব্যবহারে আমরা এতটা অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে, সওম বললে অনেকে বুঝিই না সওম কী। কোর'আনে কোথাও রোজা শব্দটা নেই কারণ কোর'আন আরবি ভাষায় আর রোজা পার্শি অর্থাৎ ইরানি ভাষা। শুধু ঐ নামাজ, রোজা নয় আরও অনেক শব্দ আমরা ব্যবহার করি যা কোর'আনে নেই। যেমন খোদা, বেহেশত, দোজখ, ফেরেশতা, জায়নামাজ, মুসলমান, পয়গম্বর, সিপারা ইত্যাদি। এই ব্যবহার মুসলিম দুনিয়ায় শুধু ইরানে এবং আমাদের এই উপমহাদেশে ছাড়া আর কোথাও নেই। এর কারণ আছে। কারণটা হল - ইরান দেশটি সমস্তটাই অগ্নি-উপাসক ছিল। প্রচণ্ড শক্তিশালী, অন্যতম বিশ্বশক্তি ইরান ছোট্ট উম্মতে মোহাম্মদীর কাছে সামরিক সংঘর্ষে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে গিয়েছিল। পরাজিত হবার পর প্রায় সমস্ত ইরানি জাতিটি অল্প সময়ের মধ্যে পাইকারিভাবে দীন ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম হয়ে গিয়েছিল। এই ঢালাওভাবে মুসলিম হয়ে যাবার ফলে তারা ইসলামের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী তা পূর্ণভাবে বুঝতে সমর্থ হল না অর্থাৎ তাদের আকিদা সঠিক হল না। তারা ইসলামে প্রবেশ করল কিন্তু তাদের অগ্নি-উপাসনার অর্থাৎ আগুন পূজার সময়ের বেশ কিছু বিষয় সঙ্গে নিয়ে ইসলামে প্রবেশ করল। ইরানিরা পূর্বে আগুন উপাসনাকে 'নামাজ' বলতো, সালাহকে তারা নামাজ বলতে শুরু করল, তাদের অগ্নি-উপাসনার ধর্মে উপবাস ছিল, তারা সওমকে রোজা অর্থাৎ উপবাস বলতে লাগল, মুসলিমকে তারা পার্শি ভাষায় মুসলমান, নবী-রসুলদের পয়গম্বর, জান্নাতকে বেহেশত, জাহান্নামকে দোজখ, মালায়েকদের ফেরেশতা, আল্লাহকে খোদা ইত্যাদিতে ভাষান্তর করে ফেলল। শুধু যে সব ব্যাপার আগুন পূজার ধর্মে ছিল না, সেগুলো স্বভাবতই আরবি শব্দেই রয়ে গেল; যেমন জাকাত, হজ ইত্যাদি। তারপর মুসলিম জাতি যখন ভারতে প্রবেশ করে এখানে রাজত্ব করতে শুরু করল তখন যেহেতু তাদের ভাষা পার্শি ছিল সেহেতু এই উপমহাদেশে ঐ পার্শি শব্দগুলোর প্রচলন হয়ে গেল। এক কথায় বলা যায় যে, আরবের ইসলাম পারস্য দেশের ভেতর দিয়ে ভারতে, এই উপমহাদেশে আসার পথে পার্শি ধর্ম, কৃষ্টি ও ভাষার রং-এ রঙিন হয়ে এল।

সংক্ষেপে ইসলামের প্রকৃত আকিদা

সওমের আকিদা নিয়ে আলোচনার পূর্বে আমাদেরকে ‘আকিদা’ শব্দ ও এর মর্মার্থ নিয়ে আলোচনা করতে হবে। আকিদা শব্দটি এসেছে ‘আক্‌দ’ থেকে। ‘আক্‌দ’ শব্দটি সাধারণত বিয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। ইসলামি বিশ্বকোষ থেকে জানা যায়, ‘আক্‌দ’ হল চুক্তি, সন্ধি, অঙ্গীকার, গেরো বা গিঁঠ (Knot) ইত্যাদি। এই চুক্তি বা বন্ধন দুইজনের মধ্যেও হতে পারে, আবার একপক্ষের ঘোষণার ক্ষেত্রেও হতে পারে। বিশ্বাস বা ধর্মবিশ্বাস বুঝাতে মুসলিম সমাজে সাধারণত দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়: ঈমান ও আকিদা। তবে বিশ্বাস অর্থে কোর'আন ও হাদিসে সর্বদা ‘ঈমান’ শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে। বিশ্বাস অর্থে কখনও ‘আকিদা’ ব্যবহৃত হয় নি। দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে তাবেয়ী (সাহাবিদের ছাত্র) ও পরবর্তী যুগের ঈমামগণ (ধর্মীয় নেতা) ধর্মবিশ্বাসের খুঁটিনাটি বিষয় আলোচনার জন্য ‘ঈমান’ ছাড়াও অন্যান্য কিছু পরিভাষা ব্যবহার করেন। এসকল পরিভাষার মধ্যে রয়েছে ‘আল-ফিকহুল আকবার’, ‘ইলমুত তাওহীদ’, ‘আস-সুন্নাহ’, ‘আশ-শরীয়াহ’, ‘উসূলুদ্দীন’, ‘আল-আক্বীদাহ’ ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে ‘আকিদাহ’ শব্দটিই অধিক প্রচলিত। বস্তুত আকিদা ও ঈমান একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত (Symbiotic) হলেও এদের অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা। ঈমান অর্থ বিশ্বাস। আর আকিদা শব্দটি যে কোনো দুটো বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ, সম্পর্ক ও সন্ধি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। যেমন সুরা মায়েদার প্রথম আয়াত, ‘হে মো'মেনগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর।’ এখানে আকিদার বহুবচন ‘উকুদ্’ শব্দটি অঙ্গীকার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার একই ধাতু থেকে উদ্গত ‘উক্বাদ’ শব্দটি সুরা ফালাকের ৪র্থ আয়াতে গ্রন্থি বা গিঁঠ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, **গ্রন্থিতে** ফুঁৎকার দানকারী জাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই।

দীনের সব প্রধান প্রধান পণ্ডিতদের সম্মিলিত অভিমত এই যে, পরিপূর্ণ ঈমান থাকা সত্ত্বেও আকিদার ভুলে একজন মো'মেনের কার্যত মোশরেক ও কাফের হয়ে যাওয়া সম্ভব। অর্থাৎ একজন মানুষ আল্লাহ, রসুল, কোর'আন, কেয়ামত, হাশর, জান্নাত, জাহান্নাম, মালায়েক ইত্যাদি সর্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ ঈমানদার হয়েও আকিদা ভুল হওয়ার দরুন কার্যত মোশরেক ও কাফের হয়ে যেতে পারে। ঐ সব বিষয়ে ঈমান পূর্ণ হলেও যদি মানুষ মোশরেক ও কাফের হতে পারে তবে অবশ্যই আকিদা ঈমানের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ, বেশি প্রয়োজনীয়। আসলেও তাই, আকিদা ঈমানের চেয়ে সূক্ষ্মতর, কিন্তু তার চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়। তার প্রমাণ বর্তমান দুনিয়ার মুসলিমদের অবস্থা। কোটি কোটি মানুষের মোকাম্মেল ঈমান, আল্লাহ, রসুল, কোর'আন ইত্যাদির উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও তারা শেরক ও কুফরের মধ্যে ডুবে আছে, আকিদার ভুলের, বিকৃতির জন্য কিন্তু বুঝতে পারছে না।

আকিদা হল কোন একটি জিনিস বা ব্যাপার সমগ্রভাবে দেখা বা বোঝা (Comprehensive Concept)। কোন বস্তু বা পদার্থ হলে সেটির সমগ্রটিকে চোখ দিয়ে দেখে সেটা কী, সেটা দিয়ে কী কাজ হয় এবং সেটার উদ্দেশ্য কী এ সমস্তই সঠিকভাবে বুঝে নেয়া হল আকিদা। এটা কোনো বস্তু বা পদার্থ না হয়ে যদি কোনো বিষয় হয় তবে সেটাকে চোখ দিয়ে নয়, বুদ্ধি, যুক্তি, চিন্তা দিয়ে সেটার সামগ্রিক রূপটাকে ধারণা করা, সেটার কাজ কী, সেটার উদ্দেশ্য কী এ সমস্তই সঠিক বুঝে নেওয়া হল আকিদা। অন্যভাবে বলা যায় যে আকিদা হল দৃষ্টি। বস্তু বা পদার্থ হলে দৈহিক চক্ষু দিয়ে সে জিনিস বা বস্তুটিকে সম্পূর্ণভাবে দেখা, আর বিষয় হলে বুদ্ধি, মনের চোখ দিয়ে সামগ্রিকভাবে দেখা ও বোঝা। দুটো উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছি।

প্রথমটা বস্তু। সেই সর্বজনবিদিত অন্ধের হাতি দেখার উপমাটাই নেওয়া যাক। পাঁচজন অন্ধ, তাদের দৃষ্টিশক্তি নেই বলে হাতড়িয়ে হাতি দেখে পাঁচ জনে হাতি সম্বন্ধে পাঁচ রকম সিদ্ধান্ত করল। যে শুঁড় হাতড়ালো তার কাছে হাতি একটা অজগর সাপের মত, যে পা হাতড়ালো তার কাছে থামের মত, যে পেট হাতড়ালো তার কাছে জালার মত, যে কান হাতড়ালো তার কাছে কুলোর মত, আর যে লেজ হাতড়ালো হাতি তার কাছে চাবুকের মত। সবগুলো অভিমতই ভুল হল। এই ভুলের কারণ মাত্র একটা- সেটা হচ্ছে এ লোকগুলির দৃষ্টিশক্তি নেই, তাই তারা চোখ দিয়ে সমস্ত হাতিটাকে সমগ্রভাবে দেখতে পারে না। যদি দৃষ্টি থাকত তবে সমগ্র হাতিটাকে একবারে দেখতে পেত; হাতি দিয়ে কী হয়, হাতির লেজ থেকে শুঁড় পর্যন্ত একটি অঙ্গের সাথে অপর অঙ্গসমূহের যোগসূত্র কী, সম্পর্ক কী, কোন অঙ্গ কোথায় অবস্থিত, অঙ্গসমূহের কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ কোনটা কম গুরুত্বপূর্ণ এবং সমগ্র হাতিটারই আকৃতি বা উদ্দেশ্য কী তা সবই সঠিক হত, অর্থাৎ হাতি সম্বন্ধে তাদের আকিদা, সামগ্রিক ধারণা (Comprehensive Concept) সঠিক হত। তাদের হাতড়াবার প্রয়োজনই হত না, যেমন বিশ্বনবীর (দ.) আসহাবদের হাতড়াবার অর্থাৎ ইসলামকে বিশ্লেষণ করার কোন প্রয়োজন হয় নি। কারণ তাদের আকিদা শেখা ছিল স্বয়ং রসুলের (দ.) কাছ থেকে।

বস্তু বা পদার্থ না হয়ে কোন বিষয় হলে তখন দৈহিক চক্ষু না হয়ে প্রয়োজন হবে মস্তিষ্কের, বুদ্ধির, মনের চোখের, যুক্তির চোখের। উদাহরণরূপে ধরুন আপনাকে চোখ বেঁধে স্টেশনের দাঁড়ানো ট্রেনের একটা প্রথম শ্রেণির বগি অর্থাৎ কামরায় নিয়ে যেয়ে আপনার চোখের বাঁধন খুলে দিলাম। তারপর আপনাকে বোঝালাম এই যে, আপনাকে যেখানে নিয়ে এসেছি এটা একটা বসবাস করার ঘর। এই দেখুন এই যে গদিমোড়া বিছানা, এ যে টেবিল, ইলেকট্রিক বাতি, পাখা, মাথার কাছে পড়ার বাতি, দরজা, জানালা, এই যে পাশেই টয়লেট, হাতমুখ ধোয়ার বেসিন, পানি ইত্যাদি

বসবাস করার জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই আছে। সুতরাং আপনি এখানে সুখে বসবাস করুন। অতি শক্তিশালী যুক্তি। আপনি যদি ঐ যুক্তি শুনে বিশ্বাস করেন যে ট্রেনের ঐ কামরা সত্যই বসবাস করার জন্য তৈরি করা হয়েছে তবে আপনার আকিদা অর্থাৎ ঐ কামরার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা (Comprehensive Concept) ভুল হল। বসবাস করার সমস্ত আয়োজন ওখানে থাকা সত্ত্বেও ওটার উদ্দেশ্য বসবাস করার জন্য নয়, ওটার উদ্দেশ্য আপনাকে সিলেট বা চট্টগ্রাম বা দিনাজপুর নিয়ে যাওয়া। আপনি শুধু ওটাকে আংশিকভাবে দেখছেন বলে বুঝতে পারছেন না ওর আসল উদ্দেশ্য কী। আপনি কামরাটা থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে খানিকটা দূরে থেকে কামরাটাকে দেখুন। এবার আপনি দেখতে পাবেন ঐ কামরার নিচে চাকা লাগানো আছে অর্থাৎ ওটার চলার জন্য। তারপর আরও একটু দূরে যেয়ে দেখলে সম্পূর্ণ ট্রেন, সেটার ইঞ্জিন, রেলের লাইন সব চোখে পড়বে। এইবার আপনি আপনার বুদ্ধি, যুক্তি, ব্যবহার করলে বুঝতে পারবেন যে বসবাস করার সব রকম ব্যবস্থা থাকলেও ঐ কামরার উদ্দেশ্য তা নয়, ওর আসল উদ্দেশ্য হল আপনাকে দূরে কোন গন্তব্য স্থানে নিয়ে যাওয়া। এইবার আপনার আকিদা (Conception) সঠিক হল। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে, একবারে সম্পূর্ণভাবে কোনো বস্তু, পদার্থ বা বিষয়কে না দেখে ওগুলোর অংশবিশেষকে দেখে ওগুলো সম্বন্ধে সঠিক আকিদা করা যায় না। ট্রেনের ইঞ্জিন, চাকা, বগি, রেললাইন, বসার আসন ইত্যাদির একটার সাথে একটার যোগসূত্র, সম্পর্ক, সন্ধি, গিঁঠ বা Knot কী- তা পুরো ট্রেনটার উদ্দেশ্য ও আকৃতি সামগ্রিকভাবে না জানলে বোঝা সম্ভব হবে না। এই সামগ্রিকভাবে জানার নামই আকিদা। নাট-বল্টু দেখে যেমন কখনও বলা যাবে না যে ওটা কেমন ইঞ্জিনের অংশ, তেমনি কোন জীবনব্যবস্থা, দীনের কোন অংশ দেখে বলা যাবে না, ওর সমগ্র রূপটি কী, ও উদ্দেশ্য কী। ঠিক ওমনিভাবে নামাজ পড়লে, রোজা রাখলে বা অমুক কাজ করলে অত হাজার সওয়াব লেখা হয়, ওমুক দোয়া পড়লে অত লক্ষ সওয়াব হয়- এ জাতীয় বিবরণ থেকেও ইসলামের আসল উদ্দেশ্য বোঝা যাবে না। অনেকটা এভাবেই এই শেষ জীবনব্যবস্থা, শেষ ইসলামের প্রকৃত আকিদা লুপ্ত হয়ে গেছে। বসবাসের আসবাবপত্র দেখে ট্রেনের কামরাকে তাই মনে করে সেখানে আরামে বাস করতে থাকলে যা হবে আজ মুসলিম উম্মাহর তাই হয়েছে। আজ তার কোন গন্তব্যস্থান নেই, কোন উদ্দেশ্য নেই, দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনের কামরায় সে বাস করছে। এই আকিদা বিকৃতির মূলে রয়েছে অতি বিশ্লেষণ, ভারসাম্যহীন বিকৃত-সুফিবাদ ও সেরাতুল মোস্তাকীম, সহজ-সরল পথকে ত্যাগ।

পূর্বে বলে এসেছি, আকিদা শব্দটির মূল হল আক্‌দ যার আক্ষরিক অর্থ গেরো, গিঁঠ, গ্রন্থি, সন্ধি (সুরা মায়েদা ১, সুরা ফালাক ৪)। একজন পুরুষ ও একজন নারীকে আক্‌দ করিয়ে দেওয়া অর্থাৎ দুজনকে গেরো দিয়ে বেঁধে দেয়া, গ্রন্থিতে আবদ্ধ করা। দুজনকে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ করার আগে তারা থাকে সম্পূর্ণ আলাদা দুটো সত্তা,

শুধুই দুজন নারী-পুরুষ। তাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ থাকে না এবং দাম্পত্য জীবনের উদ্দেশ্য থাকে না। যখনই আক্‌দ (বিবাহ) করিয়ে দেওয়া হল, তখন তারা আর পৃথক নারী-পুরুষ নয়, তাদের পরিচয় হয়ে গেল স্বামী-স্ত্রী, এবং তাদের এই সম্মিলনের উদ্দেশ্য হল দাম্পত্য জীবনের সূচনা।

ইসলামের আকিদার বেলাতেও ঐ একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যে ভাব, ধারণা ও অভিপ্রায়ে আকিদা শব্দ ঈমানের ব্যাপারে প্রয়োগ হয়েছে তা এই রকমঃ আল্লাহ, রসুল, ঐশী কেতাব, মালায়েক (ফেরেশতা), কেয়ামত, পুনরুত্থান, জান্নাত, জাহান্নাম, তকদির ইত্যাদি যে সমস্ত ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস (ঈমান) মো'মেন ও মুসলিম হতে গেলে অত্যাবশ্যক, সেগুলির প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদা বিষয়। এই প্রত্যেকটিকে এক একটি ফুল মনে করুন। এই বিভিন্ন ফুলগুলি তোলা হয়েছে সেগুলো দিয়ে একটি মালা গাঁথার জন্য। ঐ ফুলগুলির মধ্য দিয়ে সুতো পরিয়ে সূতোর দু'মাথায় একটি গেরো দিতে হবে। এই গেরো বা গ্রন্থিই আকিদা। এই গেরো না দিলে সব ফুল চারদিকে ছড়িয়ে ছিটকে পড়ে যাবে। আলাদা আলাদা ফুলগুলি শুধু ফুল, তারপর ঐ গ্রন্থি, গিঁট দিলেই তখন আর ফুল রইল না, তখন সব ফুল মিলে নতুন আরেকটি জিনিস সৃষ্টি হল, সেটা মালা। সবগুলো ফুলের মধ্যে একটা সম্পর্ক রচনা হল। ঐ গেরোটাই না দিলে ফুলগুলি যত সুন্দরই হোক, যত সুগন্ধই থাকুক, আসল উদ্দেশ্য যে মালা, সেই মালা হবে না। মালা না গেঁথে শুধু ফুলগুলি কারো গলায় পরানো যাবে না। অর্থাৎ ঐ গেরো ছাড়া অতসব সুন্দর, সুগন্ধযুক্ত ফুলগুলি অর্থহীন কারণ আসল উদ্দেশ্য হল ঐ মালা। আল্লাহ ও রসুল (দ.) মো'মেনদের কাছে ঐ মালা চান। তাই বড় বড় ফকীহরা বলেছেন- যথার্থ (মোকাম্মেল) ঈমান থাকা সত্ত্বেও আকিদার অভাবে বা বিকৃতিতে মানুষ মোশরেক ও কাফের হয়ে যেতে পারে। এবং তাই হয়েছে, পৃথিবীময় সালাত, সওম, হজ, জাকাত ইত্যাদি ছাড়াও বহু নফল এবাদত হচ্ছে, কিন্তু ঐ গিঁট, গ্রন্থির অভাবে সব ছড়িয়ে ছিটকিয়ে পড়ে আছে। মালা নেই এবং মালা নেই বলেই ঐ সব সুন্দর ফুলগুলির কোন দাম নেই। এই কারণেই নবী করিমের (দ.) সেই বাণী- এমন সময় আসবে যখন মানুষের সওম (রোজা) শুধু না খেয়ে থাকা হবে, তাহাজ্জুদ ঘুম নষ্ট করা হবে (ইবনে মাজাহ, আহমাদ, তাবারানী, দারিমি, মেশকাত)।

ঐ মালা হল উম্মতে মোহাম্মদী এবং তার চরিত্র, এবং উম্মতে মোহাম্মদীর এবং তাঁর চরিত্রের উদ্দেশ্য হল সংগ্রামের মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবীতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব কায়েম করে তাঁর সংবিধান প্রতিষ্ঠা করে ইবলিসের চ্যালেঞ্জকে পরাজিত করে ঐ বিজয়ের মালা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের গলায় পরিয়ে দেওয়া।

এই আকিদার বিকৃতির ফলে শুধু যে ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হারিয়ে গেছে তাই নয়, এর ছোটখাট উদ্দেশ্যও বিকৃত হয়ে গেছে। একটি অতি সাধারণ ব্যাপার

নিন। আল্লাহ ও তার রসুল (দ.) মেয়েদের পর্দা (হিজাব) করতে আদেশ দিয়েছেন। কেন? উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য হচ্ছে আঁটশাট কাপড় পরে, অর্ধনগ্ন হয়ে যুবতী, তরুণী মেয়েরা ঘুরে বেড়ালে তাদের দিকে চোখ পড়লে মানুষের আদিম প্রবৃত্তি স্বভাবতই মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। তাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত আত্মসংবরণ করতে পারবে না, অন্যায়ে লিপ্ত হয়ে পড়বে, পরিণতিতে হয়ত অন্যের সঙ্গে সংঘাত হবে, হয়ত পারিবারিক অশান্তি সৃষ্টি হবে, মোট কথা নানাভাবে সমাজে অশান্তি, গোলযোগ সৃষ্টি হবে, আত্মারও অবনতি হবে। তাই ঐ পর্দার, হেজাবের আদেশ। ঐটাই উদ্দেশ্য বলে যেসব মেয়েদের বয়স বেশি হয়েছে, যারা প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা হয়েছেন অর্থাৎ যাদের দেখলে কোন প্রবৃত্তি উত্তেজিত হবে না তাদের ঐ পর্দা করা থেকে রেহাই দেয়া হয়েছে (সুরা নুর ৬০)। কিন্তু আজকাল পথেঘাটে দেখবেন প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা মা, দাদিরা কিম্ভূতকিমাকার বোরকায় আপদমস্তক ঢেকে আছেন, কালো হাতমোজা, পা মোজা পরে আছেন, আর তাদের সঙ্গে আধুনিক, মেকআপ করা অর্ধনগ্না মেয়ে, নাতনিরা বাজারে বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে পর্দা করার আদেশ হয়েছে তার ঠিক উল্টোটা করা হচ্ছে। কারণ ঐ একই-উদ্দেশ্য কী, তা বোঝার শক্তির অভাব, আকিদার বিকৃতি। ইসলামের প্রতিটি ব্যাপারে আজ ঐ অবস্থা। আল্লাহ রসুল যে উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন আজ ঠিক তার উলটো উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে, মূল ব্যাপারে উদ্দেশ্যই নেই।

এখানে দুটো বিষয় স্পষ্টত মনে রাখতে হবে- উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য অর্জনের প্রক্রিয়া। অতি সংক্ষেপে আল্লাহর দীন প্রেরণের উদ্দেশ্য হল- মানুষকে পৃথিবীতে সমাজবদ্ধভাবে বাস করতে হলে তার একটি জীবনব্যবস্থা অতি-অবশ্যই প্রয়োজন। এই জীবনব্যবস্থা যদি ত্রুটিযুক্ত হয় তাহলে মানুষ অন্যায়-অবিচারের মধ্যে বাস করবে। আর যদি নিখুঁত হয় তাহলে শান্তি, ন্যায়, সুবিচারের মধ্যে থাকবে। মানুষের পক্ষে ত্রুটিহীন জীবনব্যবস্থা তৈরি করা সম্ভব নয়, সেটা সম্ভব একমাত্র মানুষের স্রষ্টার পক্ষে। তিনি নিজে তাই মানুষের জন্য একটি নিখুঁত জীবনব্যবস্থা রচনা করে সেটা যুগে যুগে তাঁর প্রেরিততের মাধ্যমে মানবজাতির কাছে পাঠিয়েছেন। আল্লাহর দীন বা জীবনব্যবস্থা পাঠানোর এটাই উদ্দেশ্য। যদি আমরা মনে করি যে, আল্লাহর আনুষ্ঠানিক উপাসনা করে তাঁর রেজামন্দি, সন্তুষ্টি হাসিল করাই দীন প্রেরণের উদ্দেশ্য তাহলে সেটা ভুল হবে। আমরা ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, নফল, মুস্তাহাব ইত্যাদি হাজার প্রকার আমল করে আসমান জমিন পূর্ণ করে ফেলি, কিন্তু সমাজে শান্তি, ন্যায়, সুবিচার প্রতিষ্ঠা না হয়, তাহলে আল্লাহর দীন প্রেরণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল; আজকে যেটা হয়েছে।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি মনে রাখতে হবে সেটা হল এই উদ্দেশ্য অর্জনের প্রক্রিয়া। আল্লাহ তাঁর শেষ রসুলকে হেদায়াহ ও সত্য জীবনব্যবস্থা দিয়ে প্রেরণ করেছেন যেন তিনি একে পৃথিবীতে বিরাজিত অন্যান্য সকল জীবনব্যবস্থার উপরে বিজয়ী করেন,

প্রতিষ্ঠা করেন। আল্লাহর দেওয়া দীন বা জীবনব্যবস্থা কীভাবে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করা হবে, সেটাই হল উদ্দেশ্য অর্জনের প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া হিসাবে আল্লাহ দিয়েছেন জেহাদের হুকুম। জেহাদ অর্থ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম। মুখে বলে, পত্রিকায় লিখে, বক্তব্য দিয়ে, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এই দীনের মর্মবাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এসবে কাজ না হলে প্রয়োজনে যুদ্ধ করে মানুষকে আল্লাহর বশ্যতা স্বীকার করাতে হবে। এ সবই জেহাদের অন্তর্ভুক্ত। মানুষ ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন কিন্তু তাদের জীবনব্যবস্থা যদি আল্লাহর না হয় তাহলে তারা ঘোর অশান্তিতে দিনাতিপাত করবে। তাই মানবজীবনে আল্লাহর দেওয়া দীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য রহমাতাল্লিল আলামিন, আখেরি নবী মোহাম্মদ (সা.)-কে দশ বছরে ১০৭টি ছোট বড় যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করতে হয়েছিল।

আজকে সমগ্র পৃথিবীতে যে হাহাকার, ক্রন্দন, যুদ্ধ, রক্তপাত- এর মূল কারণ মানুষ আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থার পরিবর্তে নিজেদের তৈরি জীবনব্যবস্থা অনুসরণ করছে। পাশাপাশি তারা ধর্মের কাজ হিসাবে বহু আনুষ্ঠানিক উপাসনা, নামাজ রোজা, জিকির-আজকার, পূজা-প্রার্থনা ইত্যাদি করছে। কিন্তু সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না। যদি সমাজে শান্তি পেতে হয়, তাহলে এরজন্য মানুষকে ধারাবাহিকভাবে এই কাজগুলো করতে হবে।

১) একমাত্র আল্লাহকে হুকুমদাতা (এলাহ) হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

২) একজন নেতার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

৩) সমগ্র পৃথিবীতে সর্বাত্মক সংগ্রামের মাধ্যমে আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

এই পদ্ধতি ছাড়া আর কোনো পদ্ধতি আল্লাহ দেননি। তাই আর কোনো পদ্ধতিতে চেষ্টা করে পৃথিবীতে শান্তি আনা যাবে না। সবাই মিলে চেষ্টা করলেও হবে না, হাজার বছর চেষ্টা করলেও হবে না।

মানবজীবন ও ইসলামের সম্পর্ক

ইসলাম কী, কেন আল্লাহ ইসলাম দিলেন, মানুষের পরিচয় কী, তার মূল দায়িত্ব বা এবাদত কী, মূল এবাদতের সঙ্গে ঈমান ও সালাত, সওম, হজ, জাকাতসহ অন্যান্য আমলের সম্বন্ধ কী- এসব প্রশ্নের উত্তর নিহিত রয়েছে মানবসৃষ্টির ঘটনার গভীরে। তাই আল্লাহ মানবসৃষ্টি ও তাকে পৃথিবীতে প্রেরণের ঘটনাগুলো কোর'আনের বহু স্থানে বারবার উল্লেখ করেছেন। আসুন, সংক্ষেপে মানবসৃষ্টির সময়ের গুরুত্ব বিষয়গুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করি।

বিশাল এই মহাবিশ্বের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র একটি গ্রহ, যার নাম পৃথিবী। সমস্ত মহাবিশ্ব সূচারুরূপে পরিচালনা করেন আল্লাহ নিজে। সামান্য একটা বিন্দু পরিমাণ বিষয়ও তার আয়ত্বের বাইরে নাই। প্রতিটি মূহূর্ত, প্রতিটি পদক্ষেপই তার নিয়ন্ত্রণে। তাঁর এই বিশাল সৃষ্টির পেছনে রয়েছে বিশাল এক পরিকল্পনা। তিনি বলছেন 'আমি কোনো কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করি নাই।' (সুরা সাদ ২৭)। ক্ষুদ্র এই গ্রহ, অর্থাৎ পৃথিবী সৃষ্টি এবং তাতে মানুষ পাঠানোর পেছনেও রয়েছে এক মহা পরিকল্পনা। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, মানুষ সৃষ্টি এবং আল্লাহর অন্য সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে বিরাট এক পার্থক্য। অন্য সমস্ত সৃষ্টি এবং মানুষ সৃষ্টির পেছনের ঘটনাও এক নয়। অন্য সকল সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহর ইচ্ছা হয়েছে তো আল্লাহ আদেশ করেছেন - 'কুন'- হও! হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী ছিলেন না এবং এখনও নন। আল্লাহর এক নাম খালেক, অর্থাৎ স্রষ্টা। তিনি প্রতিনিয়ত সৃষ্টিসহ বহুবিধ কাজে ব্যাপৃত আছেন (সুরা রহমান ২৯)। এ ব্যাপারে তিনি কারো সাথে পরামর্শ করার প্রয়োজন বোধ করেন না। কিন্তু মানুষ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। আল্লাহ ইচ্ছা করলেন মানুষ সৃষ্টি করবেন। তিনি এই ব্যাপারে মালায়েকদের আহ্বান করলেন এবং তাদের মতামত জানতে চাইলেন। কোর'আনের ভাষায়, 'নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে আমার খলিফা প্রেরণ করব' (সুরা বাকারা-৩০)। আল্লাহ লক্ষ লক্ষ সৃষ্টির মত আরেকটি সৃষ্টি করবেন এতে মালায়েকদের কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু তাদের আপত্তির কারণ হয়ে দাঁড়ালো 'খলিফা' শব্দটি। সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে আর কেউই তার খলিফা নয়। খলিফা মানে প্রতিনিধি, আল্লাহর খলিফা মানে আল্লাহর হয়ে তাঁর কাজ চালিয়ে যাওয়া। তারা খলিফা শব্দের মানে উপলব্ধি করে আপত্তি করল এই বলে যে তারা তো পৃথিবীতে যেয়ে অন্যায়, অবিচার, যুলুম, নির্যাতন এবং মারামারি কাটাকাটি, যুদ্ধ, রক্তপাত অর্থাৎ ফাসাদ ও সাফাকুদ্দিমা এক কথায় অশান্তি সৃষ্টি করবে (সুরা বাকারা-৩০)। আল্লাহ তাদের এই আপত্তিকে অগ্রাহ্য করে তাঁর নিজ হাতে খলিফা অর্থাৎ আদমকে (আ.) সৃষ্টি করলেন। আদমের ভেতরে নিজের রূহ ফুঁকে দিলেন (সুরা হিজর-২৯) এবং তিনি আদমকে বিভিন্ন জিনিসের নাম শেখালেন (সুরা বাকারা-৩১), অর্থাৎ জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দিলেন। এবার আল্লাহ মালায়েকদের আহ্বান করলেন এবং বিভিন্ন জিনিসের নাম জিজ্ঞাসা করলেন। তারা সেসব জিনিসের নাম বলতে অপারগতা প্রকাশ করল (সুরা বাকারা-৩২)। কিন্তু আদম তা বলে দিতে সক্ষম হলেন। এবার আল্লাহ মালায়েকদের আদেশ করলেন আদমকে সাজদা করতে অর্থাৎ আদম মালায়কদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ তা স্বীকার করতে। সবাই তা করল, একমাত্র ইবলিস ব্যতিত। ইবলিস অহংকার করল এবং আল্লাহর কাছে কয়েকটি জিনিস চেয়ে নিয়ে আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করল যে তুমি যদি আমাকে এই শক্তি দাও যে আমি মাটির তৈরি তোমার ঐ সৃষ্টিটার দেহের, মনের ভেতর প্রবেশ করতে পারি, তবে আমি প্রমাণ করে দেখাব যে ঐ সৃষ্টি তোমাকে অস্বীকার করবে। আমি এতদিন তোমাকে প্রভু বলে

স্বীকার করে তোমার আদেশ মতে চলেছি, এ তা চলবে না। আল্লাহ ইবলিসের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। তাকে আদমের দেহ, মন, মস্তিষ্কে প্রবেশ করে আল্লাহকে অস্বীকার করার, তার অবাধ্য হবার প্ররোচনা দেবার শক্তি দিলেন (সুরা বাকারা-৩৬, সুরা নিসা-১১৯)।

ইবলিস আল্লাহকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহবান (Challenge) করল এই বলে যে তোমার এই খলিফাকে আমি ফাসাদ অর্থাৎ অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার এবং সাফাকুদ্দিমা অর্থাৎ যুদ্ধ-বিগ্রহ রক্তপাতের মধ্যে পতিত করব। আল্লাহ এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে গ্রহণ করে বললেন- 'আমি হুকুম করলাম, তোমরা সবাই নিচে নেমে যাও। অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন হেদায়েত পৌঁছে, তবে যে ব্যক্তি আমার সে হেদায়েত অনুসারে চলবে, তার উপর না কোন ভয় আসবে, না (কোনো কারণে) তারা চিন্তাগ্রস্ত ও সন্তপ্ত হবে। (সুরা বাকারা ৩৮)। এর মানে আমি আমার প্রেরিত নবী-রসুল ও পথপ্রদর্শকদের মাধ্যমে আমার খলিফা মানুষদের জন্য এমন জীবনব্যবস্থা, দীন পাঠাব যে জীবনব্যবস্থা অনুযায়ী ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় অর্থাৎ সমষ্টিগত জীবন পরিচালিত করলে তারা ঐ ফাসাদ এবং সাফাকুদ্দিমায় পতিত হবে না, অর্থাৎ ন্যায়বিচার ও শান্তিতে (ইসলাম শব্দের আক্ষরিক অর্থই শান্তি) পৃথিবীতে বাস করতে পারবে।

আমি সর্বশক্তিমান- আমি ইচ্ছা করলেই সমস্ত মানবজাতি ইবলিসকে অস্বীকার করে আমার পাঠানো দীনকে গ্রহণ করে শান্তিতে বাস করবে (সুরা আনআম- ৩৫, সুরা ইউনুস- ১০০)। কিন্তু আমি তা করব না, কারণ আমার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আমি তোমাদের দিয়েছি পরীক্ষা করার জন্য যে তোমরা কী করো (সুরা মোহাম্মদ- ৪)। তোমরা শয়তানের প্ররোচনায় পতিত না হয়ে আমাকে একমাত্র জীবন-বিধাতা বলে গ্রহণ করলে তার ফলস্বরূপ এ পৃথিবীতে যেমন শান্তিতে (ইসলামে) বাস করবে, তেমনি পরজীবনেও আমি তোমাদের জান্নাতে স্থান দেব। তোমাদের ব্যক্তিগত সমস্ত গোনাহ আমি মাফ করে দেব কারণ তাহলে ইবলিসের চ্যালেঞ্জে তোমরা আমাকে জয়ী করালে। আর যদি শয়তানের প্ররোচনায় আমার দেওয়া জীবন-বিধানকে অস্বীকার করে নিজেরা জীবনব্যবস্থা তৈরি করে নাও তবে তার ফলস্বরূপ তোমরা সর্বপ্রকার অন্যায়-অবিচার আর রক্তপাতে ডুবে তো থাকবেই তার ওপর মৃত্যুর পর পরজীবনে আমি তোমাদের জাহান্নামের কঠিন শাস্তির মধ্যে পতিত করব। তোমাদের ব্যক্তিগত লক্ষ কোটি সওয়াব, পুণ্যের দিকে আমি চেয়েও দেখব না। কারণ তাহলে ইবলিসের চ্যালেঞ্জে তোমরা আমাকে পরাজিত করে দিলে। এটা আমার প্রতিশ্রুতি।

এখানে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, ইবলিস আল্লাহকে এ চ্যালেঞ্জ দিল না যে তোমার খলিফা, প্রতিনিধিকে আমি মসজিদে, গির্জায়, মন্দিরে, সিনাগগে, প্যাগোডায় যেতে বাধা দেব, তাদের হজ করতে, সওম রাখতে, জাকাত দিতে, দান-খয়রাত

করতে বা অন্য যে কোনো পুণ্য কাজে, সওয়াবের কাজে বাধা দেব। সে এই চ্যালেঞ্জ দিল যে মানুষকে সে ফাসাদ এবং সাফাকুদ্দিমায় পতিত করবে। অন্যায়, অবিচার, অশান্তি এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ রক্তপাত, এ দু'টোই সমষ্টিগত ব্যাপার এবং ঠিক এ দু'টোই মানুষ সৃষ্টির প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত মানবজাতির সর্বপ্রধান সমস্যা হয়ে আছে যার সমাধান আজ পর্যন্ত করা যায় নি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে মানবজাতির সম্মুখে মাত্র দু'টি পথ। একটি হচ্ছে নবী-রসুলদের মাধ্যমে পাঠানো জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করা, অর্থাৎ আল্লাহকে একমাত্র এলাহ বলে স্বীকার করা, অন্যটি হচ্ছে ঐ জীবন-বিধান প্রত্যাখ্যান করে নিজেরা জীবনব্যবস্থা তৈরি করে তাই মেনে চলা। মানবজাতিকে এই দুই পথের একটাকে গ্রহণ করতে হবে, তৃতীয় কোনো পথ নেই। আল্লাহ বললেন, যে বা যারা প্রথমটি গ্রহণ করবে এবং তা থেকে বিচ্যুত হবে না তাদের কোনো ব্যক্তিগত গোনাহ, পাপ তিনি দেখবেন না, তাদের জান্নাতে স্থান দেবেন। আর যে বা যারা নবী-রসুলদের মাধ্যমে পাঠানো জীবন-বিধান অস্বীকার করে নিজেরা জীবনব্যবস্থা তৈরি করে নেবে তাদের ব্যক্তিগত কোনো সওয়াব, পুণ্য তিনি গ্রহণ করবেন না, তাদের জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। এই যে ব্যক্তিগত বিধানের চাইতে সমষ্টিগত জীবনের বিধানকে গুরুত্ব দেওয়া, এর কারণ হচ্ছে, সমষ্টিগতভাবে আল্লাহর দেয়া জীবনবিধান কার্যকর করলে সমাজ থেকে সবরকম অন্যায়-অবিচার, দুঃখ, যুদ্ধ ও রক্তপাত বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং ব্যক্তিগত অন্যায় প্রায় লোপ পাবে। আর মানুষের নিজের তৈরি জীবনব্যবস্থা চালু করলে, ব্যক্তিগতভাবে মানুষ যত ভালো থাকার চেষ্টা করুক না কেন সমাজ সব রকম অন্যায়, অবিচার, অশান্তি ও রক্তপাতের মধ্যে পতিত হবে। উদাহরণ- বর্তমান সময়।

আল্লাহকে একমাত্র এলাহ অর্থাৎ আদেশদাতা বলে গ্রহণ করার অর্থ জীবনের প্রতি বিভাগে, প্রতি স্তরে অর্থাৎ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি ইত্যাদি প্রত্যেক অঙ্গনে গ্রহণ করা। এটাই হল তওহীদ, সেরাতুল মুস্তাকিম, দীনুল কাইয়্যেমা। যে বা যারা এর উপর অনড় থাকবে, বিচ্যুত হবে না, তার এবং তাদের ব্যক্তিগত সমস্ত গোনাহ মাফ করে আল্লাহ তাঁর জন্য জান্নাত নিশ্চিত করে দিয়েছেন।

বিশ্বনবী এ কথাটি পরিষ্কার করে দিয়েছেন এই বলে যে, আল্লাহর সাথে তাঁর বান্দার চুক্তি (Contract) এই যে, বান্দা তাঁর পক্ষ থেকে যদি এই শর্ত পালন করে যে, সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে এলাহ অর্থাৎ বিধাতা বলে স্বীকার করবে না- তবে আল্লাহও তাঁর পক্ষ থেকে এই শর্ত পালন করবেন যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন [হাদিস- মুয়ায (রা.) থেকে বোখারি, মুসলিম, মেশকাত]। এখানে অন্য কোনো কাজের শর্ত নেই। এই একটি শর্ত পালন করলে আর কোনো গোনাহই তাকে জান্নাত থেকে ফেরাতে পারবে না; এমনকি মহানবী (সা.) আবু যার (রা.) কে

বলেছেন, যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন প্রভু (ইলাহ) স্বীকার না করে তবে সে ব্যভিচার করলেও, চুরি করলেও, জান্নাতে প্রবেশ করবে (বোখারি ও মুসলিম)। একদিকে যেমন আল্লাহ তাঁর সৃষ্ট বান্দার সঙ্গে এই চুক্তি করছেন, তেমনি এ কথাও পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছেন যে, জীবনের যে কোনো অঙ্গনে, যে কোনো বিভাগে তাঁর আইন অস্বীকার করলে অর্থাৎ শের্‌ক করলে তিনি তা ক্ষমা করবেন না, লক্ষ লক্ষ সওয়াবের কাজ করলেও না, সারারাত্র তাহাজ্জুদ নামাজ পড়লেও না, সারা বছর সওম পালন করলেও না (সুরা নেসা ৪৮, ১১৬)।

আল্লাহ তাঁর নবী-রসুলদের মাধ্যমে যুগে যুগে পৃথিবীর প্রতি স্থানে, প্রতি জনপদে তাঁর সৃষ্ট জীবন-বিধান অর্থাৎ দীন পাঠিয়ে দিলেন এবং মানবজাতি যখন উপযুক্ত হল তখন সমস্ত পৃথিবী ও মানবজাতির জন্য জীবন-বিধানের শেষ সংস্করণ দিয়ে তাঁর শেষ রসুল মোহাম্মদকে (দ.) পাঠালেন। এখন কথা হচ্ছে বিধান, সংবিধান, দীন শুধু পাঠালেই কি কাজ শেষ হয়ে গেল? অবশ্যই নয়, কারণ এটা যদি গৃহীত না হয়, শয়তানের প্ররোচনায় যদি ঐ দীন প্রত্যাখ্যাত হয়, যদি তা প্রয়োগ ও কার্যকর না করা হয় তবে ঐ দীন পৃথিবীতে আসা না আসা সমান কথা। তাই আল্লাহ ওটাকে প্রয়োগ ও কার্যকর করারও বন্দোবস্ত করলেন। দীনকে প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠা করার উপায়, পদ্ধতি তিনি স্থির করলেন জেহাদ ও কিতাল - অর্থাৎ সংগ্রাম ও সশস্ত্র সংগ্রাম (সুরা বাকারা-২১৬)। অর্থাৎ জেহাদকে তিনি নীতি হিসাবে নির্দিষ্ট করলেন। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, অর্থাৎ সর্বব্যাপী তওহীদ ও ঐ তওহীদ ভিত্তিক দীন, জীবনব্যবস্থা মানবজীবনে সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগতভাবে প্রতিষ্ঠা– এই দুই হল এই দীনের মূলমন্ত্র। এবং মূলমন্ত্র বলেই তওহীদে যিনি অবিচল তার মহাপাপও (গুনাহে কবীরা) হিসাবে ধরা হবে না এবং জেহাদে যিনি প্রাণ দিয়েছেন তার তো কথাই নেই, যিনি জেহাদের অভিযানে বের হয়ে অর্ধেক রাত্রি শিবির পাহারা দিয়েছেন তারও সারা জীবনের মহাপাপ ও কোনো সওয়াবের কাজ না করাকেও উপেক্ষা করে তাকে সরাসরি জান্নাতে স্থান দেয়া হবে (হাদিস- ইবনে আ'য়েয (রা.) থেকে- বায়হাকি, মেশকাত)। এই দুই মূলমন্ত্র বাদে এ দীনে আর যা আছে সব এই দুই-এর পরিপূরক। এই দুই মূলমন্ত্র যদি মূলমন্ত্র, মূলনীতি হিসাবে না থাকে তবে বাকি আর যা কিছু আছে সবই বৃথা, অর্থহীন। এই জন্যই যার মাধ্যমে এই দীন পৃথিবীতে এসেছে সেই বিশ্বনবী বলেছেন- ভবিষ্যতে এমন সময় আসবে যখন মানুষের সওম রাখা হবে না খেয়ে থাকা, উপবাস হবে, সওম হবে না; আর গভীর রাত্রে উঠে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়া ঘুম নষ্ট করা হবে, নামাজ হবে না (ইবনে মাজাহ, আহমাদ, তাবারানী, দারিমি, মেশকাত)।

ইসলামের যেমন একটা উদ্দেশ্য আছে, তেমনি ইসলামের সকল হুকুম আহকামেরও প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা উদ্দেশ্য আছে। সত্যদীন, দীনুল হক অর্থাৎ ইসলাম আল্লাহ কেন দিলেন, কেতাব কেন নাযিল করলেন, নবী-রসুলদেরকে

কেন পাঠালেন ইত্যাদি সমস্ত কিছুরই উদ্দেশ্য আছে। আসমান-জমিন, গ্রহ-নক্ষত্র কোনো কিছুই যেমন উদ্দেশ্যহীনভাবে মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেননি, তেমনি মানুষকেও একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন। যে কোনো বিষয়ের উদ্দেশ্য জানাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনো আমল করার আগে কাজটি কেন করব এই উদ্দেশ্য জানা প্রত্যেকের জন্য অত্যাবশ্যক। সঠিকভাবে উদ্দেশ্যটা জেনে নেওয়াই হল আকিদা সঠিক হওয়া। পূর্ববর্তী সমস্ত হক্কানি আলেমরা একমত যে আকিদা সহীহ না হলে ঈমানের কোন মূল্য নেই। এই আকিদা হল কোনো একটা বিষয় সম্বন্ধে সঠিক ও সম্যক ধারণা (Comprehensive Concept, Correct Idea)। ইসলামের একটা বুনিয়াদী বা ফরজ বিষয় হল সওম বা রোজা। পূর্বের অন্যান্য ধর্মগুলোর মধ্যেও উপবাস ব্রত (Fasting) পালনের বিধান ছিল যা বর্তমানে সঠিকরূপে নেই। ইসলামের বেলাতেও একই ঘটনা ঘটেছে। কাজেই মো'মেনদেরকে অবশ্যই সওমের সঠিক আকিদা জানতে হবে। প্রথমত জানতে হবে সওম বা রোজা কার জন্য।

সওম কার জন্য?

সওমের নির্দেশ এসেছে একটি মাত্র আয়াতে, সেটা হল- 'হে মো'মেনগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের মতো তোমাদের উপরও সওম ফরদ করা হয়েছে, যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হতে পার (সুরা বাকারা-১৮৩)।' এর পরবর্তী আর তিনটি আয়াতে সওমের পদ্ধতি, কী করা যাবে, কী করা যাবে না ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সওম সম্পর্কে কোর'আনে সর্বসাকুল্যে চারটি আয়াত রয়েছে, এর মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে সওম পালনের হুকুম, আর পরের তিনটি সওম পালনের প্রক্রিয়া। কোর'আনে সওম শব্দটি যত জায়গায় এসেছে সেগুলোকে নিয়ে এই বইয়ের শেষে একটি পৃথক অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠকগণ খেয়াল করুন, সওমের নির্দেশনাটা কিন্তু মো'মেনদের জন্য, আয়াতটি শুরু হয়েছে 'হে মো'মেনগণ' সম্বোধন দিয়ে। আল্লাহ কিন্তু বলেন নি যে হে মানবজাতি, হে বুদ্ধিমানগণ, হে মুসুল্লিগণ ইত্যাদি। তার মানে মো'মেনরা সওম পালন করবে। তাহলে মো'মেন কারা? আল্লাহ সুরা হুজরাতের ১৫ নম্বর আয়াতে বলেছেন, তারাই মো'মেন যারা আল্লাহ ও রসুলের উপর ঈমান আনে, কোনো সন্দেহ পোষণ করে না এবং সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ মো'মেন। এই সংজ্ঞা যে পূর্ণ করবে সে মো'মেন। আমরা সংজ্ঞায় দুটি বিষয় পেলাম। এক, আল্লাহ ও রসুলের প্রতি ঈমান অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব (Sovereignty); যে বিষয়ে আল্লাহ ও রসুলের কোনো হুকুম, বিধান আছে সেখানে আর কারো হুকুম, বিধান মানা যাবে না। এ কথ ার উপর সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত ও দণ্ডায়মান হতে হবে। তারপর আল্লাহর এই হুকুম, বিধানকে এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি আপ্রাণ প্রচেষ্টা বা জেহাদ করবেন। তিনি হবেন মো'মেন। তার জীবন সম্পদ মানবতার কল্যাণে তিনি উৎসর্গ করবেন। সংক্ষেপে 'তওহীদ ও জেহাদ' হচ্ছে মো'মেন হওয়ার শর্ত। এই মো'মেনের জন্যই হল সওম, সালাহ, হজ সবকিছু।

ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি যার প্রথমেই হচ্ছে কলেমা তওহীদ। তারপরে সালাহ, জাকাত, হজ ও সর্বশেষ হচ্ছে সওম (আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বোখারি)। এখানে প্রথমটি হচ্ছে ঈমান আর বাকি সব আমল। যে ঈমান আনবে তার জন্য আমল। মানুষ জান্নাতে যাবে ঈমান দিয়ে, আমল দিয়ে তার জান্নাতের স্তর নির্ধারিত হবে অর্থাৎ কে কোন স্তরে থাকবে সেটা নির্ভর করবে তার আমলের উপর। এই জন্যই রসুল (সা.) বলেছেন, 'যে বলল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সেই জান্নাত যাবে (আবু যর গিফারি রা. থেকে বোখারি মুসলিম)। তাহলে এখানে পরিষ্কার দুইটা বিষয় - ঈমান ও আমল। সওম হল আমল। আর মো'মেনের জন্যই এই আমল দরকার। তাহলে বিষয়টি পরিষ্কার যে মো'মেন সওম রাখবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন সওম রাখতে হবে, সওমের উদ্দেশ্য কী?

সওমের উদ্দেশ্য কী?

আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে কাফেরদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'যারা কাফের, তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুষ্পদ জন্তুর মত আহার করে। তাদের বাসস্থান জাহান্নাম' (সুরা মোহাম্মদ ১২)। মো'মেনদের মধ্যে যেন এহেন ভোগলিপ্সা ও প্রবণতা না থাকে সেজন্যই আল্লাহ সওম ফরদ করেছেন। সওম শব্দের অর্থ বিরত থাকা অর্থাৎ আত্মসংযম (Self Control)। মো'মেন সারাদিন সওম রাখবে অর্থাৎ পানাহার ও জৈবিক চাহিদাপূরণ থেকে নিজেকে বিরত রাখবে, আত্মাকে করবে শক্তিশালী। সে অপচয় করবে না, মিথ্যা বলবে না, পশুর মতো উদরপূর্তি করবে না। সে হবে নিয়ন্ত্রিত, ত্যাগী, নিজের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গকারী এবং আল্লাহর হুকুম মানার ক্ষেত্রে সজাগ। নফসের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সে তার মনকে, আত্মাকে শক্তিশালী করবে। মো'মেনের কেন মনের উপর নিয়ন্ত্রণের দরকার? সেটার উত্তরও এ আয়াতটির মধ্যেই রয়েছে, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো (সুরা বাকারা ১৮৩)। পরিষ্কার কথা হচ্ছে, সওমের উদ্দেশ্য তাকওয়া অর্জন।

তাকওয়া অর্থ কী?

তাকওয়ার শাব্দিক অর্থ কোথায় পা ফেলছেন তা দেখে সাবধানে, সতর্কতার সাথে পথ চলা। বস্তুত আল্লাহ ন্যায়-অন্যায়ের যে মাপকাঠি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, সেই মাপকাঠি মোতাবেক ন্যায়-অন্যায়, ঠিক-অঠিক দেখে, সাবধানে জীবনের পথ চলাই হচ্ছে তাকওয়া। এটা করতে হলে প্রবৃত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ থাকা আবশ্যক। আল্লাহর দৃষ্টিতে মো'মেনের মর্যাদার মাপকাঠি হচ্ছে এই তাকওয়া। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক মুত্তাকি' (সুরা হুজরাত ১৩)। যিনি প্রতিটি কাজে সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, বৈধ-অবৈধ, ধর্ম-অধর্ম ইত্যাদি বিচার বিবেচনা করেন এবং সত্য, ন্যায়, হক ও বৈধপথ অবলম্বন করেন তিনি হলেন মুত্তাকি। যিনি যত বেশি ন্যায়সঙ্গত ও বৈধপন্থা অবলম্বন করবেন তিনি তত বড় মুত্তাকি। সুতরাং সওমের উদ্দেশ্য হল মো'মেনকে মুত্তাকি করবে, মো'মেনকে তার জীবনের লক্ষ্য অর্জনে তাকে সহায়তা করবে। তাহলে মো'মেন জীবনের লক্ষ্য কী?

মো'মেন জীবনের লক্ষ্য কী?

নবী করিম (সা.) এর জীবনের লক্ষ্য ছিল, আল্লাহর দেয়া জীবনবিধান মোতাবেক মানবজাতিকে পরিচালিত করে ন্যায়, সুবিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। এ জন্য এ দীনের নাম হল ইসলাম, শান্তি। আল্লাহ্ বলেছেন, তিনি সঠিক পথনির্দেশ (হেদায়াহ) ও সত্যদীনসহ স্বীয় রসুল প্রেরণ করেছেন যেন রসুল (সা.) একে সকল দীনের উপর বিজয়ী হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন (সুরা তওবা ৩৩, সুরা ফাতাহ ২৮, সুরা সফ ৯)। সেই সত্যদীনকে প্রতিষ্ঠা করার সর্ব উপায়ে প্রচেষ্টা চালানো প্রত্যেক মো'মেনের অবশ্য কর্তব্য, ফরদ। এই দীন প্রতিষ্ঠা করতে হলে মো'মেনের অবশ্যই কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, গুণ লাগবে। সেই চারিত্রিক, মানসিক, আত্মিক গুণ, বৈশিষ্ট্য (Attributes) এটা যে সে অর্জন করবে কোত্থেকে অর্জন করবে? সেটার জন্য আল্লাহ তার দীনের মধ্যেই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রেখেছেন। সেটা হল সালাহ, সওম, হজ, জাকাতসহ আরো বহু ধরনের আমল। এগুলোর মাধ্যমে তার চরিত্রে কিছু গুণ অর্জিত হবে। তারপর সে আল্লাহর সত্যদীন পৃথিবীময় প্রতিষ্ঠা করে মানবসমাজ থেকে অন্যায় অশান্তি দূর করতে পারবে, যেটা উম্মতে মোহাম্মদীর সৃষ্টির উদ্দেশ্য। যেমন একটি গাড়ির উদ্দেশ্য হচ্ছে তা মানুষকে বহন করে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে নিয়ে যাবে। এই গাড়ির প্রতিটি যন্ত্রাংশের (Parts) আবার ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য থাকে। চাকার উদ্দেশ্য, পিস্টনের উদ্দেশ্য, সিটের উদ্দেশ্য, স্টিয়ারিং-এর উদ্দেশ্য, ইঞ্জিনের উদ্দেশ্য আলাদা আলাদা হলেও তাদের সবার সম্মিলিত উদ্দেশ্য হচ্ছে গাড়িটির এক স্থান থেকে আরেক স্থানে চলন (Movement)। গাড়িটি যদি অচল হয়, তাহলে এর যন্ত্রাংশগুলো আলাদা আলাদাভাবে যতই ভালো থাকুক লাভ নেই। তেমনি ইসলামের একটি সামগ্রিক উদ্দেশ্য আছে; তা হল - পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে, পৃথিবীতে শান্তি বজায় রাখা। মানব সমাজে যদি শান্তিই না থাকে তখন ইসলামের সব আমলই অর্থহীন। গাড়ির যেমন প্রতিটি যন্ত্রাংশের আলাদা আলাদা উদ্দেশ্য থাকে তেমনি দীনুল হকের (ইসলাম) অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি বিষয়েরও আলাদা আলাদা উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু সবগুলো মিলিয়ে মূল লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। যেমন সালাতের উদ্দেশ্য ঐক্য, শৃঙ্খলা, আনুগত্য, সময়ানুবর্তিতা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি মো'মেনের চরিত্রে সৃষ্টি, জাকাতের উদ্দেশ্য সমাজে অর্থের সুষম বণ্টন, হজের উদ্দেশ্য মুসলিম উম্মাহর জাতীয় বাৎসরিক সম্মেলন এবং হাশরের দিন আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার আধ্যাত্মিক মহড়া। সমগ্র মুসলিম উম্মাহ বছরে একবার তাদের জাতীয় সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করবে এবং কেন্দ্রীয় নেতার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সমাধান করবে। একইভাবে সওমও মো'মেনের চরিত্রে একটি নির্দিষ্ট শিক্ষা দিয়ে থাকে। কী সেই শিক্ষা?

সওম কী শিক্ষা দেবে?

তাহলে সওম মো'মেনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করবে। মানুষের নফস ভোগবাদী, সে চায় দুনিয়ার সম্পদ ভোগ করতে, এর জন্য সে আমৃত্যু ছুটে চলে। দুনিয়ার প্রতি মানুষের এই আসক্তির কথাই আল্লাহ পাক বলেছেন, 'প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের গাফেল করে রেখেছে, যতক্ষণ না তোমরা কবরের সাক্ষাৎ লাভ করবে।' (সুরা তাকাসুর: ১-২)। অথচ আল্লাহ বলেন আখেরাতের জীবনই মুখ্য, আখেরাতের জীবনই হল প্রকৃত জীবন (সুরা আনকাবুত ৬৪)। আর আল্লাহ মো'মেনদেরকে দীন প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক সংগ্রামের নির্দেশ দিয়েছেন। মানুষের মুক্তির জন্য বিপ্লব সৃষ্টি করা, সত্যদীন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করা বিরাট কোরবানির বিষয়, ত্যাগের বিষয়, যা ভোগের ঠিক উল্টো। এটা করতে নিজেদের সমগ্র জীবন ও সম্পদকে উৎসর্গ করতে হয়। এত বড় আত্মত্যাগ করার জন্য এবং আজীবন সেটা অব্যাহত রাখার জন্য চারিত্রিক শক্তি, মানসিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হবে। এজন্যই আল্লাহ তার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হিসাবে সওমের আদেশ দিয়েছেন। মো'মেন সারা বছর খাবে পরিমিতভাবে যেভাবে আল্লাহর রসুল দেখিয়ে দিয়ে গেছেন এবং সে অপচয় করবে না, পশুর মতো উদরপূর্তি করবে না। সেখানে একটি নিয়ন্ত্রণ থাকবে। কিন্তু বছরে এক মাস দিনের বেলা নির্দিষ্ট সময়ে সে খাবে না, জৈবিক চাহিদা পূর্ণ করবে না অর্থাৎ নিজের ইন্দ্রিয়কে, আত্মাকে এই ক্ষেত্রে সে নিয়ন্ত্রণ করবে।

আল্লাহর হুকুম মানার ক্ষেত্রে সে সজাগ হবে। এটা করতে গিয়ে তার যে শারীরিক কষ্ট, মানসিক কষ্ট সহ্য করার দৃঢ়তা তৈরি হবে এটা তার জাতীয়, সামষ্টিক ও সামাজিক জীবনে প্রতিফলিত হবে। আল্লাহর হুকুম মানার ক্ষেত্রে কষ্টদায়ক হলেও সে পশুর মত ভোগবাদী হবে না, পিশাচে পরিণত হবে না, সে নিয়ন্ত্রিত হবে, ত্যাগী হবে। তার ত্যাগের প্রভাবটা পড়বে তার সমাজে। ফলে এমন একটি সমাজ গড়ে উঠবে যেখানে সবাই একে অপরের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে উৎসাহী, নিজে না খেয়ে অন্যকে খাওয়াতে আগ্রহী হবে। তাদের মধ্যে বিরাজ করবে সহযোগিতা, সহমর্মিতা।

তাহলে সওমের মূল উদ্দেশ্যটাই হল যে মো'মেনের চরিত্রে আত্মসংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ সৃষ্টির প্রশিক্ষণ। আমরা যদি সালাতকে সামষ্টিক (Collective) প্রশিক্ষণ মনে করি তাহলে সওম অনেকটা ব্যক্তিগত (Individual) প্রশিক্ষণ।

এখন প্রশ্ন হল, আমাদের সমাজে বিরাট সংখ্যক মুসলিম সওম রাখছেন। কিন্তু সওমের যে শিক্ষা তা আমাদের সমাজে কতটুকু প্রতিফলিত হল। আমরা যদি পৃথিবীতে শুধু মুসলমানদেরকে হিসাবের মধ্যে ধরি যারা আল্লাহ রসুলকে বিশ্বাস করেন, কেতাব বিশ্বাস করেন, হাশর বিশ্বাস করেন এমন মুসলমান ২০০ কোটির কম হবে না। আমরা দেখি সওমের মাস যখন আসে মুসলিম বিশ্বে খুব হুলুস্থুল

পড়ে যায়। ব্যাপক প্রস্তুতি চলতে থাকে ঘরে ঘরে। রেডিও টেলিভিশনে অনুষ্ঠান প্রচারিত হতে থাকে। পত্রিকার পাতা ভরে ওঠে ইসলামি চিন্তাবিদদের লেখা কলামে। কোর'আন হাদিসসহ বিভিন্ন গ্রন্থের রেফারেন্স দিয়ে তারা সওমের গুরুত্ব, মাহাত্ম্য, ইফতারের গুরুত্ব, সেহেরির গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয় বর্ণনা করেন। আবার কেউ কেউ সওয়াবের জন্য সেহেরির সময় মানুষকে ডেকে তোলেন। কিন্তু আমাদের সওমটা সঠিক হচ্ছে কিনা, সেটা আল্লাহর দরবারে কবুল হচ্ছে কি হচ্ছে না এই ব্যাপারে আমাদেরকে অবশ্যই ভাবতে হবে। অনেকে মনে করেন আমার সওম কবুল হয় কি হয় না আল্লাহই জানেন। কিন্তু না, শুধু আল্লাহ জানবেন কেন, আপনিও বুঝতে পারবেন আপনার সওম কবুল হচ্ছে কিনা। সওমের উদ্দেশ্য কী, সওমের ফলাফল কী সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকলে আপনি নিজেই বুঝতে সক্ষম হবেন যে, সওমের উদ্দেশ্য আপনার মধ্যে পূর্ণ হচ্ছে কিনা। উদ্দেশ্য পুরণ হলেই সেটা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে। উদ্দেশ্য পুরণ না হলে যে কোনো কাজ, যে কোনো জিনিসই ব্যর্থ। যদি সওম পালনের মাধ্যমে মো'মেনের মধ্যে আত্মসংযম সৃষ্টি হয়, আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয় তাহলে তার সওম পালন ফলপ্রসূ হয়েছে এবং তা আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হয়েছে- এ কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায়।

সওমের উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি উদাহরণ

আল্লাহ কোর'আনে কোনো বিষয়কে স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে নানারকম উদাহরণ দিয়েছেন। আমরাও একটি উদাহরণের মাধ্যমে সওমের উদ্দেশ্য বোঝার চেষ্টা করব। ধরুন একটি দেশের সেনাবাহিনীতে কিছু সৈনিক নেওয়া হবে। এক্ষেত্রে সরকার প্রথমে গণমাধ্যমে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে থাকে। যারা সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য আবেদন করেন তারা সবাই জানেন যে সেখানে তাদের কাজের উদ্দেশ্য ও কাজ কী হবে। সেটা হচ্ছে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য যুদ্ধ করা। এ বিষয়ে তাদের সকলের আকিদা, সম্যক ধারণা (Comprehensive Concept) একেবারে পরিষ্কার। একজন সৈনিকও নেই যে এ কথা জানে না যে সেনাবাহিনীর কাজ কী। সেখানে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে মিলিটারি একাডেমিতে নিয়ে উপযুক্ত, চৌকস সৈনিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু হয়। সকালে ঘুম থেকে উঠে রাতে ঘুমানো পর্যন্ত প্রতিটি মিনিট নির্দিষ্ট নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়। ড্রিল, মার্চ পাস্ট, দৌড়, সাঁতার, শরীর গঠনমূলক খেলাধুলা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, সময়ানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, আনুগত্য ইত্যাদি শেখানোর মাধ্যমে তাদের মনোদৈহিক ও পেশাগত উৎকর্ষ সাধন করা হয়। এভাবে কঠোর পরিশ্রম, শৃঙ্খলা, আনুগত্য ও নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী একজন দক্ষ সৈনিক তৈরি হয়ে ওঠে। কথা হচ্ছে, সৈনিক হওয়ার পর সে কী করবে? সে নিশ্চয়ই কখনও দেশ আক্রান্ত হলে দেশের জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে এবং প্রয়োজনে নিজের জীবন উৎসর্গ করবে, তাই

নয় কি? কিন্তু সৈনিক যদি না-ই জানে, না-ই বোঝে যে এত মহড়া, প্রশিক্ষণ, পিটি-প্যারেড, শৃঙ্খলা, আনুগত্য ইত্যাদি সমস্ত কিছুর উদ্দেশ্য ঐ দেশরক্ষার লড়াই, তাহলে এতদিনের সব প্রশিক্ষণ, সব মহড়াই তার পণ্ডশ্রম হল। এমন কি যুদ্ধের সময়ে যদি সে যুদ্ধে অংশ না নিয়ে পালিয়ে যায় অথবা ব্যারাকে নিষ্ক্রিয় বসে থাকে, তাহলেও সব পরিশ্রম বৃথা গেল। এমন করলে কর্তৃপক্ষ কি তাকে পুরস্কৃত করবে, না শাস্তির আওতায় আনবে? নিশ্চয়ই বলা যায়, পুরস্কারের তো প্রশ্নই আসে না, বরং তাকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

এবার দেখা যাক ইসলামের সঙ্গে এই উদাহরণের সম্পর্ক কী। আল্লাহ কেন ইসলাম দিলেন তা পূর্বে বহুবার বলে এসেছি। তিনি ইসলাম নামক দীন বা জীবনব্যবস্থা দিয়েছেন মানবজাতির জীবন থেকে সামগ্রিকভাবে অন্যায়, অবিচার, রক্তপাত, যুদ্ধ, মহাযুদ্ধ দূরীভূত করে মানবতা, মানবাধিকার, ন্যায়, সুবিচার, কল্যাণ, নিরাপত্তা এক কথায় অনাবিল শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য। ইবলিস আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল যে সে মানবজাতিকে সিরাতুল মুস্তাকিম (একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল এলাহ বা হুকুমদাতার বিধান অস্বীকার করা) থেকে সরাবে, যার পরিণামে মানুষ অন্যায় অশান্তি, যুদ্ধ, রক্তপাত তথা ফাসাদ ও সাফাকুদ্দিমায় পতিত হবে (সুরা বাকারা ৩০)। মানুষ যেন সেই অশান্তির আগুনে পতিত না হয় এজন্য আল্লাহ মানুষকে সঠিক পথনির্দেশ (হেদায়াহ) ও নিখুঁত জীবনব্যবস্থা (দীন) দান করলেন। তিনি রসুল প্রেরণ করে পবিত্র কোর'আনের অন্তত তিনটি আয়াতের মাধ্যমে মানবজাতিকে জানিয়ে দিলেন যে, 'তিনি আল্লাহ, যিনি স্বীয় রসুলকে সঠিক পথনির্দেশনা (হেদায়াহ) ও সত্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা (দীনুল হক) দিয়ে প্রেরণ করেছেন এইজন্য যে তিনি (রসুল) যেন এই জীবনব্যবস্থাকে পৃথিবীর অন্য সকল জীবনব্যবস্থার উপরে বিজয়ীরূপে প্রতিষ্ঠা করেন (সুরা তওবা ১১, সুরা ফাতাহ ২৮, সুরা সফ ৯)। এই প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া কী হবে সেটাও তিনি কোর'আনে দু-একটি আয়াতে নয়, শত শত আয়াতে স্পষ্ট করে বলে দিলেন। সেই প্রক্রিয়া হচ্ছে জেহাদ, সংগ্রাম ও সশস্ত্র যুদ্ধ। তিনি তাই জেহাদকে একেবারে মো'মেনের সংজ্ঞার মধ্যে অঙ্গীভূত করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তারাই মো'মেন যারা আল্লাহ ও রসুলের উপর ঈমান আনে, কোনো সন্দেহ পোষণ করে না এবং সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ (সুরা হুজরাত ১৫)। সুতরাং সত্যদীন প্রতিষ্ঠার জেহাদ বাদ দিলে কেউ মো'মেনই থাকে না।

অন্যায় অশান্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও যুদ্ধ করাকে তিনি জাতির প্রত্যেকটি সদস্যের উপর বাধ্যতামূলক করে দিলেন এই বলে যে, 'কুতিবা আলাইকুমুল কিতাল' অর্থাৎ 'তোমাদের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামকে (কিতাল) বাধ্যতামূলক করা হল (সুরা বাকারা ২১৬)'। উল্লেখ্য যে ঠিক একই শব্দগুচ্ছ 'কুতিবা আলাইকুম' আল্লাহ ব্যবহার করেছেন কিসাস ও সওম ফরদ করার ক্ষেত্রে- যেমন কুতিবা আলাইকুমুল কিসাস (সুরা বাকরা ১৭৮) ও কুতিবা আলাইকুমুস সিয়াম (সুরা বাকারা ১৮৩) যার অর্থ

যথাক্রমে তোমাদের উপর কিসাস ও সিয়াম পালন বাধ্যতামূলক, বিধিবদ্ধ, ফরদ করা হল। কিন্তু আমাদের সমাজে, সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে কিতাল ও কিসাস শব্দ দুটো বলতে গেলে প্রায় অপরিচিত। কারণ এ দুটো বিষয় নিয়ে আমাদের আলেমদের বিশেষ আলোচনা করতে দেখা যায় না। তারা এগুলো সযত্নে এড়িয়ে চলেন কেননা এ দুটোই সামষ্টিক ও জাতীয় জীবনে আল্লাহর দীন কার্যকর করার সঙ্গে সম্পর্কিত, আর তাদের আগ্রহের জায়গা হচ্ছে ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি মাসলা মাসায়েল, দোয়া-কালাম ইত্যাদি। তারা নিজেরাই সংগ্রাম, জেহাদ ও কিতাল করতে চান না, কারণ ওটা করতে গেলে বিপদ আছে, জানমাল কোরবানির প্রশ্ন আছে। অধিকন্তু কিতাল করতে প্রয়োজন রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করা। সেটা খুবই দুরূহ ব্যাপার। কাজেই রাষ্ট্রশক্তি অর্জনের কঠিন সংগ্রামের পথ তারা মাড়াতে চান না। আর দ্বিতীয় যে বিষয় অর্থাৎ কিসাস ইসলামের বিচারিক প্রক্রিয়া ও দণ্ডবিধির (Judicial Procedure and Penal Code) একটি বিষয়, যার বাস্তবায়ন রাষ্ট্রীয় জাতীয় জীবনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া সম্ভব নয়। তাই ওটাও উপেক্ষিত পড়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ (Authority) না হয়ে কিতাল বা কিসাস কোনোটারই নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ ফরদ করলেও ওগুলো পালন করা কঠিন হবে, কারণ রাষ্ট্রশক্তি অর্জন করা সহজ কথা নয়। তাই তারা কিতাল , কিসাস নিয়ে আলোচনাই বাদ দিয়ে দিলেন। কিন্তু সওম বা রোজা নিয়ে নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান, চিন্তা, গবেষণা ও ব্যস্ততার কোনো শেষ নেই, অথচ ওগুলোও আল্লাহ একইভাবে বাধ্যতামূলক করেছেন এবং সংগ্রামের ব্যাপারে কোর'আনে এতটাই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে এ সংক্রান্ত সুরা ও আয়াতগুলোকে একত্র করলে কোর'আনের প্রায় আট পারার সমান হয়ে যায়। এত গুরুত্বের কারণ এই জেহাদ, সংগ্রামই হচ্ছে উম্মতে মোহাম্মদীর জীবনের উদ্দেশ্য ও মূল কাজ। উপরে উল্লেখিত সেনাবাহিনীর উদাহরণটির অবতারণা এজন্যই করা হয়েছে। আল্লাহর রসুল (সা.) সমগ্র পৃথিবীতে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথমে একটি জাতি গঠন করলেন যার নাম উম্মতে মোহাম্মদী। তিনি তাঁর এই জাতিটিকে নিজে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিলেন, মদিনার জীবনের মাত্র সাড়ে নয় বছরে ১০৭ টি যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করলেন, ২৭ টি যুদ্ধে নিজে উপস্থিত থেকে নেতৃত্ব দিলেন। এরপর তিনি যখন দুনিয়া থেকে চলে গেলেন তার আগে নিজ হাতে গড়া জাতিটির উপরে বাকি পৃথিবীতে আল্লাহর সত্যদীন জেহাদ ও কিতালের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব অর্পণ গেলেন। প্রশ্ন আসতে পারে, আল্লাহ চান যুদ্ধ-রক্তপাত বন্ধ করতে, অথচ তিনিই কিনা যুদ্ধ করাকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন, এটা কেমন কথা হল? হ্যাঁ, এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য সাম্রাজ্য বিস্তার নয়, পরসম্পদ লুণ্ঠন নয়, আধিপত্য ও দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা নয়। এ যুদ্ধ অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে ও মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে। পার্থিব ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যারা অসহায় ও সাধারণ মানুষের উপর জুলুম অত্যাচার ও নির্যাতনের মাধ্যমে মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত করবে, মানুষকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করবে, মানবতার ধ্বংস বয়ে আনবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত করে শান্তির নিশান উড়ানোই হচ্ছে

উম্মতে মোহাম্মদীর এই সংগ্রাম ও যুদ্ধের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হয়ে যায় কোর'আনের এই আয়াতে যেখানে আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে এবং অসহায় নারী-পুরুষ আর শিশুদের (রক্ষার) জন্য লড়াই করবে না, যারা দু'আ করছে- 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এ যালিম অধ্যূষিত জনপদ হতে মুক্তি দাও, তোমার পক্ষ হতে কাউকেও আমাদের বন্ধু বানিয়ে দাও এবং তোমার পক্ষ হতে কাউকেও আমাদের সাহায্যকারী করে দাও।' (সুরা নিসা - ৭৫)'।

অপর একটি আয়াতে তিনি আরো দ্ব্যার্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন, 'তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (কিতাল) চালিয়ে যাও যে পর্যন্ত না ফিতনা (কুফর ও শিরক) নির্মূল হয়ে যায় আর জীবনব্যবস্থা (দীন) পুরোপুরিভাবে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।' (সুরা আল আনফাল - ৩৯)। পক্ষান্তরে যদি কখনও উম্মতে মোহাম্মদী তাদের উদাহরণে উল্লেখিত সৈনিকের মত এই মূল এ দায়িত্ব পালন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তাদের কী পরিণতি হবে সেটাও আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমাদের হয়েছে কী যে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে বের হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয় তখন তোমরা আরো জোরে মাটি কামড়ে ধর। তোমরা কি আখেরাতের স্থলে দুনিয়ার জীবনকেই বেশি পছন্দ কর? আখেরাতের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগ সামগ্রী তো অতি সামান্য। তোমরা যদি যুদ্ধাভিযানে বের না হও, তাহলে তোমাদেরকে ভয়াবহ শাস্তি দেয়া হবে, আর তোমাদের উপরে অন্য জাতি চাপিয়ে দেওয়া হবে। তোমরা তাঁর কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না (সুরা আত তওবা - ৩৮-৩৯)। এমনকি যদি তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি, ক্রোধ ও গজবের শিকার হতে হবে এমন কঠোর হুঁশিয়ারি পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'হে মো'মেনগণ, তোমরা যখন যুদ্ধে কাফেরদের সাথে মুখোমুখী হবে, তখন পশ্চাদপসরণ করবে না। আর যে লোক সেদিন তাদের থেকে পশ্চাদপসরণ করবে, অবশ্য যে লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তনকল্পে কিংবা যে নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয় নিতে আসে সে ব্যতীত অন্যরা আল্লাহর গযব সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। আর তার ঠিকানা হল জাহান্নাম। বস্তুত সেটা হল নিকৃষ্ট অবস্থান (সুরা আনফাল ১৬-১৭)।

সুতরাং এটা বোঝা গেল, উম্মতে মোহাম্মদী ও মো'মেনদের মূল কাজ ইবলিস ও তার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রাণান্তকর লড়াই করে পৃথিবীর মানুষের মানবাধিকার, শান্তি ও নিরাপত্তা জন্য সংগ্রাম করা। এই কাজ করতে হলে প্রতিটি সেনাবাহিনীর সৈনিকদের যেসব শারীরিক ও চারিত্রিক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন পড়ে এই জাতির প্রতিটি সদস্যকেও সেসব প্রশিক্ষণ প্রদান করতেই হবে। আর সেজন্য আল্লাহ তাঁর দীনের মধ্যেই বেশ কিছু প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রেখে দিয়েছেন, যেমন সালাহ, জাকাত, হজ, সওম ইত্যাদি। এ সবগুলোকে আমরা আমল হিসাবে চিহ্নিত করলেও এসবের উদ্দেশ্য আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা ও তাঁর খেলাফত করার জন্য প্রয়োজনীয় চরিত্র সৃষ্টি (To build characteristics)।

এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সওম। আসুন দেখি, সওমের মাধ্যমে একজন মো'মেন কী কী গুণাবলি অর্জন করতে পারে? তারা যেহেতু একটি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি কঠোর সংগ্রামী জীবনকে বেছে নিয়েছে, তাই তাদের সামনে ক্ষুধা আসবে, দারিদ্র আসবে, লোভ আসবে। তাদের ক্ষুধা সহ্য করার শক্তি লাগবে, দারিদ্র সহ্য করার শক্তি, সুখ-সম্পদ, কামনা-বাসনার প্রলোভন থেকে আত্মসংবরণ করার মত আত্মিক বল তাদের লাগবে। তাদের লাগবে সময়ানুবর্তিতা, আরামের ঘুম যেন তাদেরকে কর্তব্যকর্ম থেকে ফেরাতে না পারে সেই চরিত্র। আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করতে হলে ষড়রিপুর ষড়যন্ত্র থেকে তাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে। রসুলাল্লাহ (সা.) সওমসহ অন্যান্য বহুবিধ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাঁর সাহাবিদের চরিত্রকে একটি নির্দিষ্ট ছাঁচে (Pattern) তৈরি করেছিলেন এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ ও অনুপ্রেরণা দিয়ে সমগ্র জাজিরাতুল আরবে দীন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইসলামের প্রতিটি মো'মেন একজন সৈনিক বা মোজাহেদ (সুরা হুজরাত ১৫)। একজন পূর্ণ মো'মেনকে তার সংগ্রামে ও ব্যক্তিজীবনে নিজ আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন পড়বে। রসুলাল্লাহর সাহাবিদের ব্যক্তিগত ও সংগ্রামী জীবনে এর প্রয়োজন পড়েছিল এবং কেয়ামত পর্যন্ত যারা সেই একই উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হবে তাদেরকেও নিজেদের আত্মা বা নফসের উপরে সমানভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। বর্তমানে উম্মতে মোহাম্মদী দাবিদার জাতিটির মধ্যে জীবনের সেই উদ্দেশ্যও নেই, উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সংগ্রাম বা জেহাদও নেই; শুধু পড়ে আছে প্রশিক্ষণ। উদ্দেশ্যবিহীন প্রশিক্ষণ যে অর্থহীন, পণ্ডশ্রম সেটা বারবার বলা নিষ্প্রয়োজন।

সওম কখন উপোস থাকা হবে?

এ হাদিসটি ইতঃপূর্বে একাধিকবার উল্লেখ করেছি। নবী (সা.) বলেছেন, এমন একটা সময় আসবে যখন সওম পালনকারীর সওম (রোজা) থেকে ক্ষুধা ও পিপাসা ব্যতীত আর কিছু অর্জিত হবে না। আর অনেক মানুষ রাত জেগে সালাত আদায় করবে, কিন্তু তাদের রাত জাগাই সার হবে (ইবনে মাজাহ, আহমাদ, তাবারানী, দারিমি, মেশকাত)।

ইসলামের প্রকৃত আকিদা বুঝতে হলে এই হাদিসটির প্রকৃত অর্থ বোঝা অতি প্রয়োজন। কেন সওম পালনকারীর সওম হবে শুধু না খেয়ে ক্ষুধার্ত হয়ে থাকা অর্থাৎ রোজা হবে না এবং কেন রাত্রে তাহাজ্জুদ নামায পড়লেও সেটা শুধু ঘুম নষ্ট করা হবে, তাহাজ্জুদ হবে না। এই হাদিসে মহানবী (সা.) কাদের বোঝাচ্ছেন? হাজারো রকমের আমলের মধ্য থেকে মাত্র দু'টি তিনি বেছে নিয়েছেন। একটি সওম বা রোজা অন্যটি তাহাজ্জুদ। এর একটা ফরদ-বাধ্যতামূলক, অন্যটি নফল- নিজের ইচ্ছাধীন। বিশ্বনবী (সা.) পাঁচটি বাধ্যতামূলক ফরয এবাদত থেকে একটি এবং শত শত নফল এবাদত থেকে একটি বেছে নেয়ার উদ্দেশ্য হল এই - মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে আল্লাহ

রসুল ও দীনের উপর পরিপূর্ণ ঈমান ছাড়া কারো পক্ষে এক মাস সওম রাখা বা নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়া সম্ভব নয়। এমনকি মোকাম্মেল ঈমান আছে এমন লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে যারা তাহাজ্জুদ পড়েন না। অর্থাৎ রসুলাল্লাহ বোঝাচ্ছেন তাদের, যাদের পরিপূর্ণ দৃঢ় ঈমান আছে আল্লাহ-রসুল-কোর'আন ও ইসলামের উপর। সুফিবাদী ঘরানার অনেক মোহাদ্দিস এই হাদিসটিকে রিয়া সংক্রান্ত হাদিস অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু এই হাদিসে আল্লাহর মোনাফেক বা লোক দেখিয়ে করা যায় অর্থাৎ রিয়াকারীদের বোঝান নি। কারণ যে সব এবাদত লোক দেখিয়ে করা যায় অর্থাৎ মসজিদে যেয়ে নামায-হজ-জাকাত ইত্যাদি একটিও উল্লেখ করেন নি। মোনাফেক রিয়াকারী বোঝালে তিনি অবশ্যই এগুলি উল্লেখ করতেন যেগুলি লোক দেখিয়ে করা যায়; যেমন আল্লাহই বলেছেন, মোনাফেকরা যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন দাঁড়ায় একান্ত শিথিলভাবে লোক দেখানোর জন্য। (সুরা নিসা ১৪২)। রসুলাল্লাহও বলেছেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তার মধ্যে থাকবে একজন বড় আলিম, একজন প্রসিদ্ধ শহীদ ও একজন বড় দাতা। তারা আজীবন আল্লাহর ইবাদত বন্দগিতে কাটালেও রিয়ার কারণে তারা ধ্বংসগ্রস্থ হয়। (মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৫১৩)। অর্থাৎ জ্ঞান হাসিল, জেহাদ ও দানের মত নেক আমলও মানুষ করবে কেবল লোক দেখানোর জন্য। আলোচ্য হাদিসে রসুল এমন কোনো আমলের উল্লেখ করেননি। তিনি ঠিক সেই দু'টি আমলের উল্লেখ করলেন যে দুটি মোনাফেক ও রিয়াকারীর পক্ষে অসম্ভব, যে দু'টি লোকজন দেখিয়ে করাই যায় না, যে দুটি পরিপূর্ণ ঈমান নিয়েও সবাই করতে পারে না। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে এমন সময় আসবে যখন আমার উম্মতের মানুষ পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী হয়ে নামায-রোযা-হজ-জাকাত-তাহাজ্জুদ ইত্যাদি সর্ববিধ এবাদত করবে কিন্তু কোন কিছুই হবে না, কোন এবাদত গৃহীত-কবুল হবে না। যদি দীর্ঘ এক মাসের কঠিন সিয়াম সাধনা এবং মাসের পর মাস, বছরের পর বছর শীত-গ্রীষ্মের গভীর রাত্রে শয্যা ত্যাগ করা তাহাজ্জুদ নিষ্ফল হয়, তবে অন্যান্য সব এবাদত অবশ্যই বৃথা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যারা শুধু পরিপূর্ণ বিশ্বাসী অর্থাৎ মোকাম্মল ঈমানদারই নয়, রোজাদার ও তাহাজ্জুদী ও তাদের এবাদত নিষ্ফল কেন? তাছাড়া তাদের এবাদতই যদি বৃথা হয় তবে অন্যান্য সাধারণ মুসলিমদের এবাদতের কি দশা? মহানবীর (সা.) ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর একমাত্র সম্ভব উত্তর হচ্ছে এই যে, তিনি যাদের কথা বলছেন তারা গত কয়েক শতাব্দী ও আজকের দুনিয়ার মুসলিম নামধারী জাতি। আল্লাহ ও তাঁর রসুল (সা.) এই জাতির সম্মুখে যে উদ্দেশ্য স্থাপন করে দিয়েছিলেন আকিদার বিকৃতিতে জাতি তা বদলিয়ে অন্য উদ্দেশ্য স্থাপন করে নিয়েছে।

কষ্ট করে সওম রাখছেন, সওম পালনের জন্য এত কিছু করছেন কিন্তু সওম কবুল হবে না। কখন হবে না? এই সওম পালনকারীরা যখন সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-

অন্যায়ের পার্থক্য নিরূপণ করে না, যখন তারা আল্লাহর হুকুম মানে না, আল্লাহ যা আদেশ দিয়েছেন তা তারা মানে না, আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা তারা শোনে না। অর্থাৎ তারা আল্লাহর হুকুম থেকে বিচ্যুত, তওহীদ থেকে বহিষ্কৃত। তারা হবে স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক। এই অবস্থায় তাদের সওম হবে লোক দেখানো উপোস থাকা। তাদের সওম হবে না। উপবাস তো অন্যান্য ধর্মের মধ্যেও আছে। প্রাচীন গ্রিস, প্রাক-কলম্বিয়ান পেরু এবং নেটিভ আমেরিকান উপজাতিদের মধ্যে উপবাসের প্রচলন রয়েছে। বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, বাহাই, হিন্দু, জৈন, ইহুদি, ইয়াজিদি, মর্মন ও শিখ ধর্মে উপবাসের রীতি প্রচলিত রয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মানুসারীদের সপ্তাহের একটি দিনে দুপুর থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত উপবাসের বিধান রয়েছে। হিন্দু ধর্মেও যেকোনো ধর্মীয় পূজা, আচার অনুষ্ঠান ও বিশেষ তিথিতে উপবাস করার ধর্মীয় বিধান রয়েছে। ইহুদিদের নববর্ষে (Rosh Hashanah) উপবাসের প্রচলন রয়েছে। এ ছাড়া ইয়ম কিপুর বা প্রায়শ্চিত্তের দিনে সূর্যাস্ত থেকে পরবর্তী দিনের সূর্যাস্ত পর্যন্ত টানা ২৫ ঘণ্টা উপবাস যাপন করে তারা। কিন্তু তারা যেমন তওহীদ থেকে বিচ্যুত হয়ে উপবাসব্রত পালন করছে, যা তাদের আমল হিসাবে গৃহীত হচ্ছে না, ঠিক তেমনি মুসলিমরাও তওহীদ থেকে, আল্লাহকে একমাত্র হুকুমদাতা হিসাবে মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার থেকে বিচ্যুত হয়ে আছে। তাদেরও কোনো আমল আল্লাহর দরবারে গৃহীত হচ্ছে না। তাই তাদের সওম হচ্ছে উপবাস, আর তাহাজ্জুদ হচ্ছে নিছক ঘুম নষ্ট করা।

সমাজে সওমের প্রভাব

ইসলামের প্রতিটি আমলের উদ্দেশ্য আমাদের পৃথিবীর জীবনকে উন্নত করা। একেকটি আমল আমাদেরকে একেক দিকে অগ্রসর ও সমৃদ্ধ করে তোলে যদি সেটাকে তার উদ্দেশ্য বুঝে সঠিক আকিদায় বাস্তবায়ন করা হয়। সওম বা রোজাও এমন একটি আমল যা প্রকৃতপক্ষে মো'মেনের চারিত্রিক উন্নতির একটি প্রশিক্ষণ, যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়বে আমাদের জীবনে, আমাদের সমাজে। সওম আমাদেরকে শিক্ষা দিবে সংযম। ষড়রিপুর হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য সওম হচ্ছে ঢালস্বরূপ। (জাবির রা. থেকে মুসনাদে আহমাদ: ১৪৬৬৯)

কিন্তু সওম যদি সঠিক আকিদায় করা না হয়, তাহলে তা অর্থহীন হয়ে যাবে। একটি প্রসিদ্ধ হাদিসে আল্লাহর রসুল বলেছেন, এমন একটা সময় আসবে যখন সওম পালনকারীর সওম থেকে ক্ষুধা ও পিপাসা ব্যতীত আর কিছু অর্জিত হবে না। আর অনেক মানুষ রাত জেগে সালাত আদায় করবে, কিন্তু তাদের রাত জাগাই সার হবে (অর্থাৎ সালাত কবুল হবে না) (ইবনে মাজাহ, আহমাদ, তাবারানী, দারিমি, মেশকাত)। সরল কথায়, সওম হবে উপবাস আর তাহাজ্জুদ হবে ঘুম নষ্ট করা। সওমের উদ্দেশ্য অর্জিত হবে না অর্থাৎ তা সওম পালনকারীকে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ (অহংকার) ও মাৎসর্য্য (হিংসা) থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

এখনই সেই সময়। আমাদের সমাজে শিশু থেকে বৃদ্ধ পরহেজগারমাত্রই পারতপক্ষে রমজান মাসের ফরজ সওম ভঙ্গ করে না। রোগীরাও পারতপক্ষে সওম ভাঙেন না, যদিও রোগীদেরকে আল্লাহ ছাড় দিয়েছেন। কিন্তু সেই সওম যে ফলপ্রসূ হচ্ছে না তার প্রমাণ বাস্তব সমাজের দিকে দৃষ্টি দিলেই আমরা দেখতে পাই। সওম তো আমাদের সংযম শিক্ষা দেওয়ার কথা। লোভ থেকে, মিথ্যাচার থেকে বিরত রাখার কথা। কথা হচ্ছে, এই সওম যদি আমাদেরকে সংযমী করতো তাহলে একটা মুসলিমপ্রধান দেশে কীভাবে সওমের মাসে খাদ্যদ্রব্যের দাম সারা বছরের চেয়ে বেশি হয়?

এটা ইতিহাস যে, রসুলাল্লাহ (সা.) এবং সাহাবি ও তাবে-তাবেয়ীনদের যুগ থেকে শুরু করে সমগ্র সোনালি যুগে রমজান মাসে বাজার দর সবচেয়ে মন্দা যেত। বাজারে জিনিস-পত্রের দাম থাকত সব চেয়ে কম। কারণ বিত্তবানরা এ মাসে কেনা কাটা, খাওয়া দাওয়া করতেন কম। তারা নিজের জন্য ভোগ্যপণ্য কেনাকাটা না করে ঘুরে ঘুরে গরীব দুঃখীদের দান করতেন। স্বল্প ও সীমিত আয়ের লোকেরা যে খাবার অন্য মাসে খেতে পারতো না, তারা রমজান মাসের মন্দা বাজারে তা কিনতে পারতো। কিন্তু বর্তমানে রমজান মাসে অর্থশালীরা খাদ্য বস্ত্র সব কিছুতেই বেশি ব্যয় করেন। তাদের বিত্তের আক্রমণে বাজারের হাল-হাকিকত হয় বেসামাল। একশ

টাকার মাছ পাঁচ/ছয়শত টাকায় বিক্রি হয়। রমজান মাস আসার আগেই চাল, ডাল, আটা, চিনি, লবণ, পেঁয়াজ, রসুন, তেল ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় সব কিছুর মূল্যই ধাঁই ধাঁই করে বেড়ে চলে। এতে সীমিত ও স্বল্প আয়ের মানুষের অবস্থা রমজানে ত্রাহী ত্রাহী। অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামের যুগের সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র। সংযমের কোনো চিহ্নই থাকে না, অন্য সময়ের চেয়ে খাওয়ার পরিমাণ ও ব্যয় বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। অথচ আল্লাহ বলেছেন, যারা কুফরি করেছে তারা ভোগ-বিলাসে লিপ্ত থাকে এবং পশুর মত আহার করে। তাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম (সুরা মোহাম্মদ ১২)।

সওমের মাসে যদি সতিকার অর্থে সংযম থাকত তাহলে মুসলিম বিশ্বে দারিদ্র্য থাকত না। যারা অবস্থাসম্পন্ন তারা যদি সংযমী হতেন যে এই একটি মাস আমরা লোকদেখানো সংযম নয়, সত্যিকারভাবে সংযম করব, তাহলে যতটুকু তারা ব্যয় সংকোচন করছেন সেটা সমাজের মধ্যে উপচে পড়তো। ষোলো কোটি মুসলমানের মধ্যে পাঁচ কোটিও যদি সংযম করে, ক্ষুধার্তের কষ্ট উপলব্ধি করে সেই ভোগ্যবস্তু অন্যকে দান করত তাহলে জাতীয় সম্পদ এমনভাবে উপচে পড়ত নেওয়ার লোক খুঁজে পাওয়া যেত না। সেটাই হতো সওমের বাস্তব প্রতিফলন। যদি অন্যান্য মাসে ভোজ্য তেলের লিটার থাকত দুশ টাকা, এই মাসে থাকত পঞ্চাশ টাকা। অন্যান্য মাসে গোশত যদি থাকত ছয়শ, টাকা এই মাসে থাকত দুশ টাকা। কারণ মানুষ নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করছে, চাহিদা থাকলেও খাচ্ছে না। ফলে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পেত। যে এগারো মাস ঘুষ খায় সে যদি এই একটি মাসে না খায় তাহলে তার একটি বিরাট প্রভাব সমাজে পড়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে আমরা উল্টোটাই দেখি। এই মাসটিকে ব্যবসায়ীরা বাড়তি উপার্জনের মাস হিসাবে নির্বাচন করে। খাদ্যে আরো বেশি বিষাক্ত রাসায়নিক মেশানো হয়। টাকার জন্য মানুষ মানুষকে বিষ খাওয়াচ্ছে, সংযম তো দূরের কথা।

কথা ছিল, সংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রভাব মানুষের শরীরের মধ্যে পড়বে, মনের মধ্যে পড়বে। এতে একদিকে ব্যক্তি পরিশুদ্ধ হবে, অন্যদিকে সমাজ সমৃদ্ধ হবে। বাস্তবে যখন এর উল্টো ঘটছে তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে, আমাদের সওম হচ্ছে না।

আইয়্যামে জাহেলিয়াতের ভোগবাদী সমাজ ইসলামের ছায়াতলে আসার পর কেমনভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল সেটা ইতিহাস। যে সমাজে নারীকে ভোগ্যবস্তু মনে করা হতো, সেই সমাজে এমন নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে একজন যুবতী নারী একাকী সারা দেহে অলঙ্কার পরে শত শত মাইল পথ যেতে পারত, তার মনে কোনো ক্ষতির আশঙ্কাও জাগত না। মানুষ নিজের উপার্জিত সম্পদ দান করার জন্য উট বোঝাই করে নিয়ে ঘুরত, গ্রহণ করার মতো লোক খুঁজে পেত না। শেষে মুসাফিরখানায় দান করে দিত। আদালতগুলোয় মাসের পর মাস কোনো অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগ আসতো না। ইসলাম প্রতিষ্ঠার পূর্বে আরবের গেফার গোত্রের

পেশাই ছিল ডাকাতি। সেই গোত্রের মানুষ আবু যর (রা.) নিজ গোত্রকে সঙ্গে নিয়ে সত্যের পক্ষে আমৃত্যু লড়াই করে গেছেন। রাস্তায় কেউ সম্পদ হারিয়ে ফেললে তা অবশ্যই ফেরত পাওয়া যেত। মানুষ স্বর্ণালঙ্কারের দোকান খোলা রেখেই মসজিদে চলে যেত, কেউ চুরি করত না। মানুষ জীবন গেলেও মিথ্যা বলত না, ওজনে কম দিত না। এই যে শান্তিপূর্ণ অবস্থা কায়েম হয়েছিল এটা কেবল আইন-কানুন দিয়ে হয় নি। মানুষের আত্মায় পরিবর্তন না আনতে পারলে কঠোর আইন দিয়ে চরিত্র ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করা যায় না। যে সমাজের মানুষগুলো কিছুদিন আগেও ছিল চরম অসৎ তাদের আত্মায় এমন পরিবর্তন আনা কী করে সম্ভব হয়েছিল? সেটা হচ্ছে এই সালাত, সওম ইত্যাদি চারিত্রিক প্রশিক্ষণের প্রভাব।

সেই সালাত, সওম তো আজও কম হচ্ছে না, তাহলে এর ফল নেই কেন?

তার প্রথম কারণ - সওম রাখার প্রথম শর্ত হচ্ছে তাকে মো'মেন হতে হবে। এই আদেশ মো'মেনের প্রতি। যে জাতি মো'মেন নয় তারা হাজার সওম পালন করলেও তা কাঙ্ক্ষিত ফল দেবে না। কিন্তু এই জাতি মো'মেন না। আল্লাহ বলেছেন, তারাই মো'মেন যারা আল্লাহ ও রসুলের উপর ঈমান আনে, কোনো সন্দেহ পোষণ করে না এবং সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ মো'মেন (সুরা হুজরাত ১৫)। এই সংজ্ঞা যে পূর্ণ করবে সে মো'মেন। আমরা সংজ্ঞায় দুটি বিষয় পেলাম।

এক, আল্লাহ ও রসুলের প্রতি ঈমান অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে মেনে নেওয়া। যে বিষয়ে আল্লাহ ও রসুলের কোনো হুকুম-বিধান, আদেশ-নিষেধ আছে সেখানে আর কারো হুকুম মানা যাবে না - এই কথার উপর সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত ও দণ্ডায়মান হওয়া। বর্তমানের মুসলিম নামক জনগোষ্ঠী আল্লাহর হুকুমের পরিবর্তে পাশ্চাত্য সভ্যতার হুকুম বিধানকেই তাদের জাতীয় ও সামষ্টিক জীবনে গ্রহণ করে নিয়েছে। সুতরাং তারা তওহীদে নেই। তারা মো'মেন হওয়ার প্রথম শর্তটি পূরণ করেনি।

দুই, তওহীদে আসার পর আল্লাহর এই হুকুম-বিধানকে এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জন্যে সর্বাত্মক সংগ্রাম (জেহাদ) করতে হবে। তার জীবন-সম্পদ মানবতার কল্যাণে, আল্লাহর রাস্তায় দীন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে উৎসর্গ করতে হবে। এই মো'মেনের জন্যই হল সওম, সালাহ, হজ, জাকাত ও অন্যান্য আমল। এই জাতি আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামও বাদ দিয়েছে বহু শতাব্দী আগে। তাই মো'মেনের সংজ্ঞার দ্বিতীয় শর্তটিও পুরণ করছে না। অর্থাৎ তারা আল্লাহর দেওয়া সংজ্ঞা মোতাবেক মো'মেন নয়।

সওমের কোনো প্রভাব সমাজে কেন পড়ছে না তার দ্বিতীয় কারণ হল, জাতির মধ্যে তাকওয়া, সত্যমিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় বোধের সৃষ্টি করা হয়নি। আজকে অন্যান্য

জাতির কথা বাদই দিলাম আমাদের মুসলমানদের মধ্যে ন্যায়-অন্যায় বোধের কোনো চিহ্ন নেই। স্বার্থই হয়ে দাঁড়িয়েছে ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ড। এ বিষয়গুলো আজকে আমাদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে, ভাবতে হবে। ভাবতে হবে এই জন্য যে আমরা মুসলমান ২০০ কোটি। একের পর এক যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলিম দেশগুলোকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আমরা জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদোপম মসজিদ বানাচ্ছি, আমাদের সওম পালনকারীর (রোজাদার) কোনো অভাব নাই, হাজীর হজের কমতি নেই, নামাজের কোনো অভাব নাই। কিন্তু ন্যায় অন্যায় বোধ এ জাতির মধ্যে নেই। এতেই বোঝা যায় আমাদের সালাত-সওমসহ অন্যান্য আমল কতটুকু গৃহীত হচ্ছে।

মুসলিম বিশ্বে রমজানের মাস আসতে না আসতেই দামী দামী পোশাক কেনা শুরু হয়। কথা ছিল এ মাসে আমি পোশাক কিনব গরীব মানুষের জন্য, সে হিন্দু হোক বা মুসলিম। কিন্তু কোথায় কী? যেখানে ইরাক-সিরিয়া, ফিলিস্তিনের মুসলমানেরা উদ্বাস্তু হয়ে অভাবের তাড়নায় ইউরোপের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করছে সেখানে অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতে চলে ইফতার আর ঈদের নামে খাদ্য ও সম্পদের বিপুল অপচয়। সওম তাদেরকে কোনো সংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ, কোনো সহমর্মিতাবোধ শিক্ষা দিচ্ছে না। এভাবেই তাদের সওম তার প্রকৃত সার্থকতা না পেয়ে উপবাসে পর্যবসিত হচ্ছে। এভাবেই রসুলাল্লাহর ভবিষ্যদ্বাণী আজ সত্যে পরিণত হচ্ছে।

আজকে যদি কেউ আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ, জীবনবিধাতা, হুকুমদাতা হিসাবে স্বীকৃতি না দিয়ে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রোজা রাখে, তাকে সাধুবাদ জানানো হবে। মুসলমান নয় কেবল অমুসলিম, হিন্দু, খ্রিষ্টানরাও তাকে উৎসাহিত করবে, এমনকি ইফতার মাহফিলেরও আয়োজন করে তাদের ইফতার করাবে। হোয়াইট হাউজেও টানা দুই দশক ধরে প্রতি বছর মুসলিমদের পবিত্র মাস রমজান উপলক্ষে ইফতার ও নৈশভোজ আয়োজন করা হয়। মাঝখানে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর এটি বন্ধ করা হয়েছিল। পরে আবার তিনি সেটি বহাল করেন (বিবিসি, ২৬ জুন ২০১৭)। ওদিকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন মুসলমানদের নামাজ পড়ার জন্য রাশিয়া বৃহত্তম মসজিদ নির্মাণ করে দিয়েছেন মস্কোতে যার নাম ক্যাথেড্রাল মস্ক। এখানে একসাথে দশ হাজার লোক নামাজ পড়তে পারে (বাংলা নিউজ ২৪, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫)।

প্রশ্ন হচ্ছে, নবী করিম (সা.) এর উপরে মক্কার কাফেররা এত নিপীড়ন কেন চালিয়েছিল? তিনি যদি তৎকালীন কাবা ঘরের রক্ষক, আল্লাহ বিশ্বাসী মক্কার ঐ কাফেরদেরকে বলতেন, আমি শুধু বছরে একমাস রোজা রাখব, কাবার সামনে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ব, প্রতি বছর একবার কাবাকে কেন্দ্র করে হজ করব, দান খয়রাত করব, তখন তারাও নিশ্চয়ই বলত, বেশ ভালো তো! কর না। তোমাকে ওগুলো করার জন্য আমরা আরো সুন্দর বন্দোবস্ত করে দেই। কিন্তু ইতিহাস কী বলে? তারা রসুলাল্লাহকে গালি দিয়েছে, কারাগারে অবরুদ্ধ করেছে, আঘাত করেছে, রক্তাক্ত

করেছে, হত্যার চেষ্টা করেছে এবং শেষ পর্যন্ত দেশ থেকে বের করে দিয়েছে। এর কারণ একটাই। তিনি আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ হিসাবে মানার ঘোষণা দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি মক্কার নেতাদের আনুগত্য না করে শুধু আল্লাহর আনুগত্য করার ঘোষণা দিয়েছেন। সেটাই ছিল তাদের শত্রুতার মূল কারণ। কাজেই সওম পালন করার পূর্ব শর্ত হবে আল্লাহকে ইলাহ (তিনি সেই সত্তা যার হুকুম মানতে হবে) হিসাবে ঘোষণা দেওয়া। যারা এই ঘোষণা দেবে না, তাদের সওম পালন হবে উপবাস থাকা। এখন যদি আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ হিসাবে কেউ ঘোষণা দেয়, অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম বিধান ছাড়া বর্তমানে প্রচলিত মানুষের তৈরি কোনো হুকুম বিধান মানি না- এই ঘোষণা দেয়, তখনই আজকে যারা রোজাদারদেরকে বড় আয়োজন করে ইফতার খাওয়াচ্ছে, আলিশান মসজিদ বানিয়ে দিচ্ছে তারাই বলবে, এই লোকগুলো উগ্র, জঙ্গি, মৌলবাদী। এদেরকে জেলে দেওয়া হবে, নিপীড়ন করা হবে, ফাঁসিও দেওয়া হবে।

তাহলে কথা পরিষ্কার হয়ে গেল, এই যে কোটি কোটি মুসলমান শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে রোজা রেখেই যাচ্ছেন, কিন্তু সমাজে সেই রোজার কোনো সুফল দেখা যাচ্ছে না। কেন? এর প্রধান কারণ- আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ হিসাবে না মেনে অর্থাৎ আল্লাহর নাজিল করা বিধান, হুকুম জাতীয় রাষ্ট্রীয় জীবনে কার্যকর না করে এই রোজা রাখা হচ্ছে। কাজেই তওহীদবিহীন এই ধরনের আমল ব্যর্থ হচ্ছে এবং হবে।

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রুখতে পারে সওম! কীভাবে?

মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে। যে দ্রব্যগুলো মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাথে যুক্ত, যেসব ছাড়া মানুষ বাঁচে না, সেগুলোর দাম প্রতিবছর পূর্ববর্তী বছরের রেকর্ড ভাঙছে। এটা নিয়ে কত আন্দোলন হচ্ছে, সরকার পর্যন্ত পতন হয়ে যাচ্ছে। সরকার দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট ও ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের মাধ্যমে ভ্রাম্যমান আদালতন চালু করেছে, ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু করছে, টিসিবির ট্রাক নামাচ্ছে, মিডিয়ায় ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটকে হুমকি ধামকি দিচ্ছে কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। নিচের ছোট্ট পরিসংখ্যানটি প্রমাণ করে যে সরকারগুলো দ্রব্যমূল্য কমাতে নিদারুণভাবে ব্যর্থ হচ্ছে, যদিও বেশ কিছু দিন আগের হিসাব (সূত্রঃ ১৪ জানুয়ারি, ২০২৪, দৈনিক প্রথম আলো)।

প্রশ্ন হল, এর কি সমাধান নেই? হ্যাঁ, সমাধান আছে। তবে কোনো একটি সামাজিক ও জাতিগত সমস্যা একদিক থেকে সমাধান করা সম্ভব নয়। এর সাথে অনেকগুলো নিয়ামক বা ফ্যাক্টর জড়িত। প্রথম কথাই হচ্ছে, রাষ্ট্রকাঠামোর আমূল পরিবর্তন করে আল্লাহর দেওয়া রাষ্ট্রকাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে। তৃতীয়ত, বাণিজ্যব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা একটি শোষণমূলক ব্যবস্থা যা মানুষে মানুষে বিপুল আয়বৈষম্য সৃষ্টি করে। সুদভিত্তিক অর্থনীতির কারণে

গুটিকয় পুঁজিপতির কাছে জাতির অধিকাংশ সম্পদ জমা হয়ে যাচ্ছে আর অপরদিকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বঞ্চিত হচ্ছে। এ কারণেই বর্তমানে বিশ্বের ৬৩% সম্পদ মাত্র ১% ধনীর হাতে জমা হয়ে গেছে (১৭ জানুয়ারি ২০২৩, দৈনিক প্রথম আলো)। এই ব্যবস্থায় ধনীদের মাধ্যমে ব্যবসায়িক সিন্ডিকেট তৈরি হচ্ছে, যা অধিক মুনাফার লোভে নিত্যপণ্যসহ সকল পণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে বাজারমূল্য বাড়িয়ে তুলছে। ধনতন্ত্রের চর্চার ফলে ব্যাংক, বিমা, স্টক মার্কেটসহ প্রচুর আর্থিক প্রতিষ্ঠান তৈরি

নিত্যপণ্য ও সেবার দাম

৭ জানুয়ারি, ২০১৯ ও ১১ জানুয়ারি, ২০২৪-এর হিসাব

পণ্য	২০১৯ (টাকা)	২০২৪ (টাকা)
গ্যাস দুই চুলা	৮০০ টাকা	এখন ১,০৮০
মোটা চাল	৩৮-৪২	৪৮-৫২
সরু চাল	৫৪-৬২	৬০-৭৫
খোলা আটা	২৭-৩০	৪৫-৫০
ডিজেল প্রতি লিটার	৬৫	এখন ১০৯
খোলা সয়াবিন	৭৮-৮৪	১৫৫-১৬০
চিনি	৪৮-৫৫	১৪০-১৪৫
পানি ঢাকা ওয়াসার (প্রতি হাজার লিটার)	১১.০২ টাকা	এখন ১৫.১৮
মোটা মসুর ডাল	৫৫-৬০	১০৫-১১০
অ্যাংকর ডাল	৩৫-৫০	৬৫-৭৫
আলু	২০-৩০	৫০-৬০
পেঁয়াজ	২০-৩৫	৮০-১০০
রসুন	৪০-৮০	২২০-২৬০
জিরা	৩২০-৪৫০	৮৫০-১,০৫০
ব্রয়লার মুরগি	১২৫-১৩০	১৯৫-২০০
গরুর মাংস	৪৭০-৫০০	৬৫০-৭০০
ডিম	৩৪-৩৬	৪২-৪৫

ডিম হালিতে, অন্যান্য পণ্যের একক কেজি ও লিটারে

হয়েছে যেগুলোর মাধ্যমেও প্রচুর অর্থ জমা হয়ে যাচ্ছে। অর্থের এক জায়গায় জমা হয়ে যাওয়ার কারণে সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও জালিয়াতি সৃষ্টি হচ্ছে। এটা

যেন হতে না পারে এজন্যই আল্লাহ সুদকে হারাম করেছেন এবং ব্যবসাকে হালাল করেছেন (সুরা বাকারা ২:২৭৫)। শেষ জীবনব্যবস্থায় অর্থনীতির প্রণেতা স্বয়ং স্রষ্টা, আল্লাহ। এই ব্যবস্থার ভিত্তি নীতি (Basic principle) হচ্ছে সম্পদকে মানুষের মধ্যে দ্রুত গতিতে চালিত করা, কোথাও সঞ্চিত হতে না দেওয়া। পুঁজিবাদ বলছে সম্পদ খরচ না করে সঞ্চয় কর; সবার সঞ্চয় একত্র কর, পুঞ্জীভূত কর (ব্যাংকে), আল্লাহ কোর'আনে বলছেন দান কর, ব্যয় কর, সম্পদ জমা কোরো না, পুঞ্জীভূত কর না। অর্থাৎ ইসলামের অর্থনীতি পুঁজিবাদী অর্থনীতির ঠিক বিপরীত। একটায় সঞ্চয় কর অন্যটায় ব্যয় কর।

তাই কোনোভাবেই সুদের ব্যবসা, ব্যাংকিং, লেনদেন চালু রাখা যাবে না। পরিবর্তে সুদমুক্ত, ঝুঁকি ও মুনাফার অংশীদারত্বের (Risk and Profit Sharing - Mudarabah and Musharakah) ভিত্তিতে অর্থাৎ সুদ হবে না এমন যৌক্তিক বাণিজ্যনীতি প্রবর্তন করতে হবে। পাশাপাশি ব্যবসায়িক সিন্ডিকেট নিশ্চিহ্ন করতে হবে যেন বড় বড় শিল্পপতিদের দাপটে ছোট-মাঝারি বিনিয়োগকারীদের পুঁজি হারাতে না হয়। সেটার জন্য কয়েকটি স্তরে বিনিয়োগের ক্ষেত্রগুলো সজ্জিত করতে হবে। বৃহৎ পুঁজির মালিকদের উৎপাদন ও বিনিয়োগের ক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট থাকবে যেন স্বল্পপুঁজির ব্যবসায়ীরা বাজারে টিকে থাকতে পারে। যেমন ঔষধ উৎপাদনকারী বৃহৎ কোম্পানি হলুদ মরিচের ব্যবসা করতে যাবে না। সেটা করবে মাঝারি বা ক্ষুদ্র পুঁজির উদ্যোক্তারা।

এই সবগুলো নিয়ামকই দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এর বাইরে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য যে নীতি গ্রহণ করতে হবে তা হল, যে পণ্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে, সেই পণ্যের যোগান বাড়ানোর চেষ্টা করা। অর্থাৎ পণ্যটা যাতে বাজারে পর্যাপ্ত থাকে তা নিশ্চিত করা। যোগান বাড়লে দাম কমবে এটা সরল হিসাব। এই যোগান বাড়ানো যেতে পারে দুইভাবে- উৎপাদন বাড়ানোর মাধ্যমে অথবা আমদানির মাধ্যমে। বাজারে পণ্যটার যোগান ঠিক রাখা গেলে, দোকানে সরবরাহ ঠিক থাকলে, আর অসাধু ব্যবসায়ীরা অবৈধভাবে মজুদ করতে না পারলে পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা খুবই সহজ।

কিন্তু যদি পণ্যটা আমদানি বা উৎপাদন করা সম্ভব না হয়? ধরুন বাংলাদেশে যে পণ্যের দাম বেড়ে গেছে, সেই পণ্যটা পাওয়া যায় ইউক্রেনে। এতদিন ইউক্রেন থেকে ব্যবসায়ীরা পণ্যটা আমদানি করত। এখন যুদ্ধের কারণে পণ্য আমদানি করা যাচ্ছে না। কিংবা ধরুন, পণ্যটা এতদিন আমদানি করা হতো রাশিয়া থেকে। রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ হওয়ায় এখন আর দেশটি আর পণ্য রপ্তানি করতে পারছে না। আবার বাংলাদেশেও সেই পণ্যটা ব্যাপকভাবে উৎপাদন করাও যাচ্ছে না, কারণ বাংলাদেশের আবহাওয়া জলবায়ু এই পণ্য উৎপাদনের সহায়ক নয়, দক্ষ জনশক্তিও নাই, পর্যাপ্ত কৃষিজমি নেই। তখন কী করণীয়?

তখন রয়েছে দ্বিতীয় উপায়। সেটা হল- পণ্যটার চাহিদাও কমিয়ে ফেলা। মনে রাখতে হবে জনগণ যে জিনিস কিনবে না, সেটার দাম এমনিতেই কমে যাবে। ধরা যাক সয়াবিন তেলের দাম বেড়ে যাবার পর জনগণ সয়াবিন তেল খাওয়া বাদ দিয়ে সরিষা তেল খাওয়া শুরু করল, কিংবা সয়াবিন তেল যারা খাচ্ছে খুবই অল্প পরিমাণে খাচ্ছে। এতে কিছুদিনের মধ্যেই সয়াবিন তেলের যোগান বেড়ে যাবে এবং তার ফলে দাম কমতে শুরু করবে। তবে সাধারণত এভাবে চাহিদা কমানোর মাধ্যমে দাম কমানোর নজির খুবই কম। কেননা জনগণ কখনই ঐক্যবদ্ধভাবে কোনো পণ্যের ব্যবহার বন্ধ করতে পারে না। জনগণ ঐক্যবদ্ধ নয়।

আরেকটা কথা জেনে রাখা আবশ্যক- যে পণ্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে সেটার চাহিদা এমনিতেও কিছুটা কমে যায়, তবে সেটা আশানুরূপ নয়। অর্থাৎ যতটা চাহিদা কমলে দাম কমে যাবে ততটা চাহিদা কমে না। বিশেষ করে পণ্যটা যদি নিত্য প্রয়োজনীয় কোনোকিছু হয়, তাহলে চাহিদা কমে না বরং চাহিদা আরও বেড়ে যায়। তখন সবার মধ্যেই পণ্যটা মজুদ করে রাখার প্রবণতা তৈরি হয়। কয়েক বছর পূর্বে লবণের দাম নিয়ে গুজব রটার পর দেখা গিয়েছিল অবিশ্বাস্য রেটে সাধারণ মানুষ লবণ কিনে বাড়িতে জমা করে রাখছে। অর্থাৎ দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের চাহিদাও যেন বেড়ে গিয়েছিল!

এদিকে জাতির ধনিক শ্রেণির দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই- নিত্য প্রয়োজনীয় কোনো ভোগ্যবস্তুর দাম বেড়ে গেলেও জনগণের এই অংশকে কোনো ভোগান্তি পোহাতে হয় না, বা চাহিদা কমানোর কথা ভাবতে হয় না। দাম বাড়ার পরও ধনীরা সেই পণ্যটা যত ইচ্ছা কিনতে থাকে ও ভোগ করতে থাকে। যেহেতু বাজারে বেশি দামে অনেকে কিনছেই, তাই সেই পণ্যটার দাম কমার সম্ভাবনাও আর থাকে না। ব্যবসায়ীদের ব্যবসা ঠিক থাকে, উচ্চবিত্তদের জীবন-জীবিকাও ঠিক থাকে, উৎপাদকরাও সীমিত উৎপাদন দিয়েই প্রচুর মুনাফা অর্জন করতে থাকে, শুধু মানবিক বিপর্যয়ে পড়ে যায় হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী!

এই কারণেই মূলত ভোগবাদী সমাজে চাহিদা কমানোর মাধ্যমে পণ্যের দাম কমানোর কথা চিন্তাও করা যায় না। একটা ভোগবাদী সমাজে মানুষ বেঁচেই থাকে ভোগ করার জন্য। যার বেশি সামর্থ্য সে বেশি ভোগ করে, অল্প সামর্থ্য থাকলে অল্প ভোগ করে। কিন্তু সামর্থ্য থাকার পরও বৃহত্তর স্বার্থে ভোগ না করার মানসিকতা এই সমাজে কখনই গড়ে ওঠে না। দেশের আর্থসামাজিক হালচাল যা-ই হোক, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আগের চেয়ে একটু কম খাওয়া, একটু কম মানের পোশাক পরা, একটু কম খরচের চেষ্টা করার কথা ভাবতেও পারে না ভোগবাদী সমাজের মানুষ। তাই এই দিকটা নিয়ে বর্তমানের পুঁজিবাদী অর্থনীতির ধারক-বাহকরা তেমন একটা আশাবাদী হতে পারে না। যারা সরকারের নীতিনির্ধারণ করেন, তারাও ভালোভাবেই জানেন একটা পণ্যের দাম ১০গুণ বেড়ে গেলেও জনগণের একাংশ সেই পণ্য কিনবেই।

রাষ্ট্রপ্রধানও যদি পণ্যটি না খাওয়ার জন্য বা কম খাওয়ার জন্য জাতিকে আহ্বান করেন, জাতি সেই আহ্বান মানবে না। তাই নীতি-নির্ধারকরা পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির সমাধান হিসেবে সবসময় যোগান বাড়ানো, আমদানি বাড়ানো, শুল্ক কমানো, ভ্যাট কমানো ইত্যাদি গতানুগতিক পন্থাকেই বেছে নেন। এসবে কাজের কাজ কিছুই হয় না, তা সবাই জানেন।

অথচ আমরা যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করি, আমাদের সমাজে দ্বিতীয় সূত্রটাই কিন্তু বেশি ফলপ্রসূ হবার কথা ছিল। আমাদের সমাজের ধনী বা গরিব যে শ্রেণির কথাই বলি- তাদের কিন্তু ভোগবাদী ও বস্তুবাদী হবার কথা ছিল না। বরং কথা ছিল তারা নিজেরা না খেয়ে অন্যকে খাওয়াবে। তাদের ঘরে যদিও ফ্রিজভর্তি খাবার থাকে, লকারভর্তি টাকা থাকে, তথাপি তারা নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে, সংযমে রাখবে। এই সংযম যদি কোনো জনগোষ্ঠীর মধ্যে থাকে তাহলে সেখানে খুব সহজেই অর্থনৈতিক সঙ্কটের সমাধান করা সম্ভব, আবার এই সংযম না থাকলে শত আন্তরিক প্রচেষ্টাতেও অর্থনৈতিক সঙ্কটের সমাধান সম্ভব নয়।

রমজান মাসে মুসলিমদের ফরজ আমল হল সওম। সওম মানেই আত্মসংযম। আল্লাহ বছরের বারো মাসের মধ্যে একটামাস নির্ধারণ করেছেন যেই মাসে মুসলিম জনসাধারণ নিজেদের জীবনে সংযমের শিক্ষা অর্জন করবে। নিজেদের নফসকে নিয়ন্ত্রণের অনুশীলন করবে। তারপর যেই সংযম সে অর্জন করতে পারল, সেটার প্রতিফলন ঘটাবে বাকি এগারো মাসের জীবন-যাপনে। রমজান মাসে একজন মুসলিমের পেটে ক্ষুধা থাকে, টেবিলে খাবার থাকে, কিন্তু সে না খেয়ে থাকে। এই না খাওয়াটা তার নিজের জন্য নয়, আল্লাহর জন্য। ঠিক তেমনি রমজান মাস ছাড়াও একজন মুসলিম বহুকিছু খাবে না, বহু খরচ করবে না শুধুই আল্লাহর জন্য, মানবতার কল্যাণের জন্য, সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য। সওম যেমন ধনী-দরিদ্র সবার জন্য ফরজ, তেমনি সমাজের স্বার্থের জন্য নিজের চাহিদাকে কমিয়ে আনার দায়িত্বও ধনী-দরিদ্র সবাইকেই পালন করতে হবে।

আমাদের সওম যদি সত্যিকারের সওম হতো তাহলে একটা সওমই যথেষ্ট হতো বহু অর্থনৈতিক সঙ্কটের সমাধান এনে দেওয়ার জন্য। সমস্যা হল- আমরা সওম পালন করি, কিন্তু সওমের উদ্দেশ্য বুঝি না এবং সওমের শিক্ষা চরিত্রে ধারণ করারও চেষ্টা করি না। আমরা সওমের নামে শুধু না খেয়ে থাকি। আর মনে করি- সওমে না খেয়ে কষ্ট পাওয়ার মধ্যেই আছে সওয়াব। সন্ধ্যা পর্যন্ত সওয়াব অর্জনের পর মাগরিবের আজানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সংযমের লাগাম ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে ভোগবাদী আসল চেহারাটা! একবেলা না খেয়ে থাকার পর আরেকবেলায় দুইগুণ বেশি খাবার খেয়ে কষ্টের মাশুল আদায় করি! ফল হয় এই যে, রমজান মাস এলে দ্রব্যমূল্য কমার বদলে বেড়ে যায় কয়েকগুণ। পরিহাস আর কাকে বলে!

হাদিসের আলোকে ব্যর্থ সওম

সওমের উদ্দেশ্য কী? পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে তাকওয়া অর্জন অর্থাৎ ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি। বাকি সবকিছুই হচ্ছে আনুষঙ্গিক। অথচ এই আনুষঙ্গিক বিষয়গুলোর উপরে হাজার হাজার ফতোয়া, মাসলা-মাসায়েলের কেতাব রচনা করা হয়েছে। ঐ রকম মাসলা-মাসায়েল নিয়ে আলোচনা করা আমাদের লক্ষ্য নয়। একটি হাদিস আমরা প্রায়ই শুনি যে সওম পালনকারীর মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর কাছে মিশকাম্বরের সুগন্ধের চেয়ে প্রিয়। (বুখারি, মুসলিম)। এই হাদিস সহিহ, জাল নাকি জয়িফ সে বিতর্কে যাব না, তবে দুর্গন্ধ আল্লাহর প্রিয় হতে পারে কিনা সে প্রশ্ন থেকেই যায়। ধরে নিলাম হাদিস সঠিক। তথাপি সওম পালনকারীর মুখের দুর্গন্ধ থেকে থেকে শহীদের রক্ত আল্লাহর কাছে আরও বেশি প্রিয়। ইসলামের সবচেয়ে মর্যাদাবান হচ্ছেন যিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে জীবন দিবেন। কোন সওম পালনকারীর মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর কাছে প্রিয় সেটাও বুঝতে হবে। রসুলাল্লাহ (সা.) তো এও বলেছেন যে একটা সময় আসবে যখন মানুষ সওম রাখবে কিন্তু তা উপোস থাকা হবে, সওম হবে না। যার সওম কবুল হয় না তার মুখের দুর্গন্ধ কি আল্লাহর কাছে প্রিয়? অবশ্যই নয়। কাজেই কোন সওম প্রকৃত সওম আর কোন সওম স্রেফ উপবাস সেটা লেখাই এই পুস্তিকার লক্ষ্য, মাসলা লেখার পুস্তিকা এটা নয়। সেহেরির দোয়া কী, ইফতারের দোয়া কী, কোন সময় সেহরি-ইফতার করতে হবে এগুলো হচ্ছে মাসলা। তবুও জরুরি কিছু মাসআলা আমরা পরবর্তী একটি অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। আজকে আমরা নিখুঁত সওম রাখি, ঘড়ি ধরে বসে থাকি। আজান দেওয়ার এক সেকেন্ড আগেও ইফতার করি না, যেন সওমটা নষ্ট না হয়। কিন্তু সওম নষ্ট হয়ে গেছে বহু আগে। এটা এখন উপলব্ধি করতে হবে, সওমের আসল শিক্ষাটা সবাইকে ধারণ করতে হবে। আরেকটি হাদিস আছে যেখানে আল্লাহর রসুল (সা.) বলেছেন, আল্লাহ আমাকে পাঁচটি কাজের আদেশ করেছেন। আমি তোমাদেরকে সেই পাঁচটি কাজের দায়িত্ব অর্পণ করছি।

(১) তোমরা ঐক্যবদ্ধ হবে

(২) (নেতার আদেশ) শুনবে

(৩) (আদেশকারীর হুকুম) মান্য করবে

(৪) (আল্লাহর হুকুম পরিপন্থী কার্যক্রম থেকে) হেজরত করবে

(৫) আল্লাহর রাস্তায় জীবন-সম্পদ দিয়ে জেহাদ (সংগ্রাম) করবে।

যারা এই ঐক্যবন্ধনী থেকে এক বিঘত পরিমাণও দূরে সরে যাবে, তাদের গলদেশ থেকে ইসলামের বন্ধন খুলে যাবে যদি না সে তওবা করে ফিরে আসে। আর যে জাহেলিয়াতের কোনো কিছুর দিকে আহ্বান করে সে জাহান্নামের জ্বালানি পাথরে পরিণত হবে, যদিও সে সালাত আদায় করে, সওম রাখে এমন কি নিজেকে মুসলিম

বলে বিশ্বাসও করে [হারিস আল আশয়ারী (রা.) থেকে আহমদ, তিরমিজি, বাব-উল-ইমারত, মেশকাত]।

আল্লাহপ্রদত্ত এই কর্মসূচি রসুলাল্লাহ (সা.) তাঁর উম্মাহকে দান করেছেন, সেই কর্মসূচি মোতাবেক উম্মতে মোহাম্মদী সংগ্রাম করে গেছেন এবং ন্যায়, সুবিচার, শান্তি, প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু আজ মুসলমান নামক জনসংখ্যা সেই ঐক্যবন্ধনীতে নেই। অথচ এ হাদিসটিতে বলা হয়েছে যারা এই কর্মসূচির ঐক্যবন্ধনী থেকে আধ হাতও সরে যাবে তদুপরি জাহেলিয়াতের দিকে আহ্বান করবে তারা জাহান্নামের জ্বালানি পাথরে পরিণত হবে, তারা যতই সালাত আদায় করুক, যতই সওম রাখুক, এমন কি নিজেকে মো'মেন মুসলিম বলে বিশ্বাস করুক। অর্থাৎ তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে কাফের হয়ে যাবে। সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ হাদিস। খেয়াল করুন এখানে প্রথম ধারাটি হল ঐক্য অর্থাৎ তওহীদের উপরে ঐক্য। বর্তমানে এই মুসলিম দাবিদার জাতিটি শিয়া সুন্নিসহ হাজারোভাগে বিভক্ত। রাজনৈতিক আর ধর্মীয় মারামারি, যুদ্ধ, রক্তপাতে আমরা নিজেরা নিজেরাই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি, সত্যদীন থেকে আধ হাত নয়, লক্ষ্য মাইল দূরে সরে গেছি। আমরা সারাদিন উপোস করছি আর ভাবছি সওম কবুল হচ্ছে, খুব সওয়াব হচ্ছে, অথচ সারা বিশ্বে অনাহারী ত্রাণশিবিরের বাসিন্দা মুসলিমদের ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করছি না। অনর্থক আমার দেহ শুকিয়ে লাভ কী? না, এটার মধ্যে কোনো মাহাত্ম্য নেই। বরং অন্য ভাইকে খেতে দিয়ে আমি যদি আমার দেহকে নিঃশেষ করি সেখানেই আমার মাহাত্ম্য। এজন্য আল্লাহ রসুল (সা.) বলেছেন, সওম তাদেরই হবে যারা আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হবে। তাদের জাতির সামগ্রিক লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রতিটি সদস্যের ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রশিক্ষণ হল সওম। যারা ঐ নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ নয়, তাদের সওম অর্থহীন। হাদিসে রসুলাল্লাহ স্পষ্টতই বলেছেন, যারা ঐক্যবদ্ধনীতে থাকবে না, তাদের সওম রেখেও লাভ হবে না।

সওম নিয়ে পণ্ডিতদের চুলচেরা বিশ্লেষণ ও বাড়াবাড়ি

রসুলাল্লাহর জীবনী ও হাদিস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কখনও কখনও তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, রেগে লাল হয়ে গেছেন। আমরা জানি, ক্রোধ ষড়রিপুর অন্তর্ভুক্ত। তবে কি আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব কি রিপুর কাছে পরাজিত হয়ে গেলেন? অসম্ভব! কারণ তিনিই বলেছেন, সবচেয়ে বড়ো পালোয়ান সেই ব্যক্তি যে নিজের ক্রোধকে পরাজিত করতে পারে (আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে মুসলিম, হাদিস-৬৪০৩)। তাহলে সেই সর্বরিপুজয়ী মহামানব কী কারণে রেগে লাল হয়ে গেছেন? নিশ্চয়ই এর কোনো উপযুক্ত কারণ ছিল এবং সেটা কোনো সাধারণ বিষয় ছিল না। রসুল অক্লান্ত পরিশ্রম করে সমগ্র পৃথিবীতে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে অপরাজেয় জাতি তথা উম্মতে মোহাম্মদী সৃষ্টি করলেন; সেই জাতিবিনাশী

কর্মকাণ্ড তাঁর সামনে ঘটলে তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হতেন এবং ক্রোধান্বিত হওয়াটা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। জাতির ঐক্য, শৃঙ্খলা, আনুগত্য, জেহাদ ইত্যাদি জাতির অস্তিত্ব রক্ষার প্রধান শর্ত। সেই ঐক্যবিনাশী কোনো কথা বা কাজ হতে দেখলে রসুল বিন্দুমাত্র ছাড় দিতেন না। এই জাতিবিনাশী কাজগুলোর একটি হচ্ছে দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি ও অতি বিশ্লেষণ। বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

একদিন একজন লোক এসে আল্লাহর রসুলের (সা.) কাছে অভিযোগ করলেন যে ওমুক লোক নামাজ লম্বা করে পড়ান, কাজেই তার (পড়ানো) জামাতে আমি যোগ দিতে পারি না। শুনে তিনি (সা.) এত রাগান্বিত হয়ে গেলেন যে -বর্ণনাকারী আবু মাসউদ (রা.) বলছেন যে- আমরা তাকে এত রাগতে আর কখনও দেখি নি [হাদিস-আবু মাসউদ (রা.) থেকে বোখারি]।

একদিন আল্লাহর রসুলকে (সা.) জানানো হল যে কিছু আরব সওম রাখা অবস্থায় স্ত্রীদের চুম্বন করেন না এবং রমজান মাসে সফরে বের হলেও সওম রাখেন। শুনে ক্রোধে বিশ্বনবীর (সা.) মুখ-চোখ লাল হয়ে গেল এবং তিনি মসজিদে যেয়ে মিম্বরে দাঁড়িয়ে আল্লাহর হামদ বলার পর বললেন- সেই সব লোকদের কী দশা হবে যারা আমি নিজে যা করি তা থেকে তাদের বিরত রেখেছে? আল্লাহর কসম তাদের চেয়ে আমি আল্লাহকে বেশি জানি এবং বেশি ভয় করি [হাদিস-আয়েশা (রা.) থেকে বোখারি, মুশলিম, মেশকাত]।

আল্লাহ যতটুকু করতে বলেছেন তার থেকে বেশি করা সীমালংঘন, জুলুম। আল্লাহর বিধানের মধ্যে কঠোরতা বা তাশাদ্দুদ আরোপ করার ফলে কী হয়? আল্লাহর দীনের যে সহজ-সরল বৈশিষ্ট্য তা হারিয়ে দীন দুর্বোধ্য, জটিল, কষ্টকর ও কঠিন হয়ে পড়ে। তখন মানুষ দীনের বিধান পালনের বিষয়ে বিরূপ হয়ে যায়। দীন সাধারণ মানুষের বোধগম্যতা ও পালনের বাইরে চলে যায়। গুটিকয়েক লোক অতি কষ্ট করে এসব নিয়ম-কানুন পালন করেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বিধি-বিধান পালনের ক্ষেত্রে বীতশ্রদ্ধ ও হতাশ হয়ে পড়ে। এমন যেন না হতে পারে সে বিষয়ে আল্লাহর রসুল সদা-সর্বদা তাঁর সাহাবিদেরকে নসিহত ও নির্দেশ দিয়ে গেছেন এবং নিজেও সে মোতাবেক আদর্শ স্থাপন করেছেন। একটি উদাহরণ দিই। আনাস (রা.) বলেন, "একবার নবী (সা.) এর সঙ্গে আমরা সফরে ছিলাম। আমাদের কেউ সিয়াম পালন করেছেন আবার কেউ ছেড়ে দিয়েছেন। এরপর প্রচণ্ড গরমের সময় আমরা এক প্রান্তরে অবতরণ করলাম। চাদরবিশিষ্ট লোকেরা আমাদের মধ্যে সর্বাধিক ছায়া লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। যারা সিয়াম পালন করছিল তারা কোন কাজই করতে পারছিল না। যারা সিয়াম রত ছিল না, তারা উটের তত্ত্বাবধান করছিল, খেদমতের দায়িত্ব পালন করছিল এবং পরিশ্রমের কাজ করছিল। তখন রসুলাল্লাহ বললেন, আজ তো সওম ভঙ্গকারীরা সমুদয় সওয়াব অর্জন করে নিল (বোখারি: ২৬৯১, মুসলিম: ২৪৯৩)।

সফরে সওম রাখার কষ্টকর অবস্থা থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য আল্লাহ সওম রাখতে নিষেধ করেছেন, এটা বান্দার প্রতি আল্লাহর রহমত। রসুলাল্লাহর জীবদ্দশায় সওম নিয়ে কোনো কঠোরতা কেউ আরোপ করতে পারেনি। বাড়াবাড়ির আতিশয্যে যারা সফরেও কষ্ট করে সওম রাখা শুরু করলেন বিশ্বনবীর (সা.) ভর্ৎসনা শুনে তারা আবার ভারসাম্য ফিরিয়ে আনলেন। কিন্তু আজ এই জাতিকে কে বাড়াবাড়ি থেকে ফিরিয়ে আবার ভারসাম্যে আনবে? নবী তো আর আসবেন না, সুতরাং এ কাজ তাঁর প্রকৃত উম্মাহকেই করতে হবে।

আমার দেখা একটি ঘটনা বলছি। এক ভদ্রলোক উমরা হজ করতে যাবেন। তাঁর বয়স পঁচাত্তরের বেশি। তাঁর সঙ্গে অন্তত আরো চল্লিশজন সমবয়স্ক মানুষও উমরা পালন করতে যাবেন। প্রক্রিয়া সম্পাদন করতে করতে রমজান মাস শুরু হয়ে গেল। পহেলা রমজান তাঁর সৌদি আরবের মক্কায় যাওয়ার ফ্লাইট। বাংলাদেশে তখন চৈত্রমাসের লম্বা দিন। ভোর চারটায় উঠে তিনি প্রথম রমজানের সেহরি খেলেন। ছয়টার মধ্যে ঢাকা বিমান বন্দরে গিয়ে চার ঘণ্টা বসে থাকলেন। অপেক্ষার পর সোয়া দশটায় বিমান উড়ল। বিমান প্রথমে গেল দুবাইতে, সেখানে কয়েক ঘণ্টার বিরতি। তারপর গেল জেদ্দা, তারপর সেখান থেকে মক্কা। বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে দশটায় তিনি মক্কায় গিয়ে পৌঁছলেন। সারা রাস্তায় এই মানুষগুলি সওম রেখেছেন।

সৌদি আরবের সময় আমাদের দেশ থেকে তিন ঘণ্টা কম, অর্থাৎ সেখানে সূর্যাস্ত হয় বাংলাদেশের তিন ঘণ্টা পর। মুসাফির বা অসুস্থ মানুষের জন্য সওম প্রযোজ্য নয়, এ কথা পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, "যে লোক অসুস্থ অথবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করে নিবে (সুরা বাকারা ১৮৫)। কিন্তু হজ এজেন্সির মুয়াল্লিম (শিক্ষক বা তত্ত্বাবধায়ক), শুনেছি তিনি নাকি একজন মুফতি, তিনি হাজিদেরকে সওম ভাঙার অনুমতি দিলেন না। যুক্তি হিসাবে বলা হল, রসুলের যুগে উত্তপ্ত মরুভূমির মধ্যে উটের পিঠে সফর করতে হত। বর্তমানে প্লেনে করে সফর আরামদায়ক। তাই বর্তমানে ঐ বিধানের সুবিধা নেওয়া চলবে না। ফলে এই বৃদ্ধ মানুগুলোকে সেদিন প্রায় সাড়ে ষোল ঘণ্টা সওম রাখতে হয়েছিল। ফ্লাইটে তাঁর চেয়েও অশক্ত মানুষ ছিলেন, তাদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম জারি থাকল।

এটাই হচ্ছে দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি, যা আল্লাহ সম্পূর্ণরূপে হারাম, নিষিদ্ধ করেছেন। বিদায় হজের ভাষণেও আল্লাহর রসুল বলেছেন, "হে মানুষ! তোমরা কখনোই দীন (বিধি-বিধান) নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না- কারণ অতীতে বহু জাতি ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ির কারনে ধ্বংস হয়ে গেছে।" তিনি আবু মুসা (রা.) ও মু'আয (রা.) কে ইয়ামেনে দীন প্রচার, প্রশাসনিক ও কূটনৈতিক দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করার সময় বলেছিলেন, "তোমরা (দীন পালনকে) সহজ কর, কঠিন করো না। সুসংবাদ দাও,

বীতশ্রদ্ধ করো না। পরস্পর মেনে ও মানিয়ে চলো, মতবিরোধ করো না। (বোখারি ৩০৩৮, মুসলিম ৪৬২৬)।

আমরা বর্তমানে যেমন দেখি, আমাদের আলেম ওলামারা রমজান মাসে বেশ আয়োজন করে প্রশ্ন-উত্তরের অনুষ্ঠান করেন। সেখানে সওম পালনের খুঁটিনাটি মাসলা-মাসায়েল নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। প্রশ্নের সংখ্যা হাজার হাজার। বেশিরভাগই কী করলে সওম ভাঙবে তা নিয়ে, যেমন ঢেকুরের সঙ্গে আসা খাবার বা দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবার গিলে ফেললে রোজার ক্ষতি হবে কিনা, রোজাদার ব্যক্তি পানিতে বায়ু ছাড়লে রোজা নষ্ট হবে কিনা, রোজা অবস্থায় এন্ডোস্কপি করা যাবে কিনা ইত্যাদি। কিন্তু আল্লাহর রসুল বেশি প্রশ্ন করা অপছন্দ করতেন। ফলে তাঁর সাহাবিরাও তাঁকে খুব কমই প্রশ্ন করতেন।

ইমাম দারিমি (রহ.) তাঁর সুনান আদ-দারেমি নামক হাদিস গ্রন্থে এ সম্পর্কে সাহাবি ও তাবেয়ীদের কিছু মতামত উল্লেখ করেছেন। যেমন ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "আমি রসুলাল্লাহর সঙ্গীদের চাইতে উত্তম কোনো মানব দল কখনো দেখিনি। রসুলাল্লাহর গোটা যিন্দেগীতে তাঁরা তাঁকে মাত্র তেরটি প্রশ্ন করেছেন। এর সবগুলোই কোর'আনে উল্লেখ হয়েছে। যেমন: 'হে নবী! এরা তোমাকে হারাম মাসগুলোতে যুদ্ধ সংক্রান্ত বিধান জিজ্ঞেস করছে'। অথবা হে নবী তাঁরা তোমার নিকট হায়েয সংক্রান্ত বিধান জানতে চাচ্ছে' -প্রভৃতি।

অতঃপর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন: "সাহাবিগণ কেবল সেইসব প্রশ্নই করতেন, যা ছিল তাঁদের জন্যে উপকারী।" তাঁরা প্রশ্ন করতেন নানা ঘটনার প্রেক্ষিতে। সম্ভাব্য পরিরিস্থিতি কল্পনা করে কোনো প্রশ্নই তারা করতেন না। এমন প্রশ্ন কেউ করলে উমর (রা.) তাকে রীতিমত অভিশাপ দিতেন। উমার (রা.) মিম্বারে আরোহণ করে বলেছেন, "আমি আল্লাহর নাম নিয়ে যা ঘটেনি সে সম্পর্কে কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রশ্ন করাকে নিষিদ্ধ করছি। কারণ যা কিছু ঘটবে তার সব কিছুরই বিবরণ আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন (দারেমি ১/৫০)।

কাসেম (রা.) লোকদের সম্বোধন করে বলেন: "তোমরা এমনসব বিষয়ে প্রশ্ন করছ, যেসব বিষয়ে প্রশ্ন করার জন্যে আমরা কখনো মুখ খুলিনি। তাছাড়া তোমরা এমনসব বিষয়েও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করছ যা আমার জানা নেই। সেগুলো যদি আমার জানা থাকত, তবে তো নবী করীমের (সা.) ফরমান অনুযায়ী সেগুলো তোমাদের বলেই দিতাম।"

উমার ইবনে ইসহাক (রহ.) বলেছেন: "রসুলাল্লাহর অর্ধেকের বেশি সাহাবির সংগে সাক্ষাতের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আমি তাঁদের চাইতে অধিক জটিলতামুক্ত এবং কঠোরতা বর্জনকারী মানব গোষ্ঠীর সাক্ষাত পাইনি।"

মূলত সাহাবিরা রসুলাল্লাহকে যা করতে দেখতেন, যেভাবে করতে দেখতেন সেটার অনুসরণ করতেন। এটাই ছিল রসুলাল্লাহর শিক্ষাদানের পদ্ধতি। তিনি কখনও ব্যাখ্যা করে বলেননি যে ওজুর চার ফরজ না ছয় ফরজ, কয়টা ওয়াজিব, কয়টা সুন্নত ইত্যাদি। এগুলো বহু পরে ফকিহরা গবেষণা করে বের করেছেন।

অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কোনো বিষয়ে মসলা জানতে চাইলে বিশ্বনবী (সা.) প্রথমে তা সরলভাবে বলে দিতেন। কিন্তু কেউ যদি আরও একটু খুঁটিয়ে জানতে চাইতো তাহলেই তিনি রেগে যেতেন। কারণ তিনি জানতেন ঐ কাজ করেই অর্থাৎ অতি বিশ্লেষণ ও ফতোয়াবাজি করেই তার আগের নবীদের জাতিগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। কিন্তু তাঁর অত ক্রোধেও, অত নিষেধেও কোনো কাজ হয় নি। পরবর্তীতে তাঁর জাতিটিও ঠিক পূর্ববর্তী নবীদের (আ.) জাতিগুলোর মতো দীন নিয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে অতি মুসলিম হয়ে মসলা-মাসায়েলের তর্ক তুলে বিভেদ সৃষ্টি করে হীনবল, শক্তিহীন হয়ে শত্রুর কাছে পরাজিত হয়ে তাদের গোলামে পরিণত হয়েছে।

সওমের কাফফারা আমাদের কী শিক্ষা দেয়

এক ব্যক্তি নবীর (সা.) নিকট এসে অনুতাপের সঙ্গে বলল, 'এই বদ-নসিব ধ্বংস হয়েছে।'

নবী জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কী হয়েছে?'

- আমি সওম থাকা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করে ফেলেছি।

- তোমার কি একজন ক্রীতদাস মুক্ত করার ক্ষমতা আছে?

- না;

- ২ মাস সওম থাকতে পারবে?

- না।

- ৬০ জন গরিবকে খাওয়াতে পারবে?

- না।

এমন সময় এক লোক বড় পাত্রভরা খেজুর নিয়ে আসলো। তখন নবী (সা.) ঐ ব্যক্তিকে বললেন, 'ঐ খেজুর নিয়ে যাও এবং স্বীয় গোনাহর কাফফারা হিসেবে সদকা দাও।'

সে বলল, এটা কি এমন লোককে দেব যে আমার চেয়ে অধিক গরিব? আমি কসম করে বলছি, আমার মতো গরিব এ এলাকায় আর কেউ নেই।'

হাদিসে এসেছে, তিনি এ কথা শুনে স্বভাবগত মৃদু হাসির চেয়ে একটু অধিক হেসে বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি তোমার পরিবারবর্গকেই খেতে দাও। (আয়েশা রা. থেকে বোখারি, ২য় খণ্ড, ৮ম সংস্করণ; আ. হক, পৃঃ ১৭৫)।

আল্লাহ মানুষকে কষ্ট দিতে চান না, পরিশুদ্ধ করতে চান (সুরা মায়েদা ৬)। তাই তিনি ইসলামের ভিতরে যে কোনো বাড়াবাড়িকে হারাম করেছেন। যারা মো'মেন তাদেরকে আল্লাহ জাহান্নাম দিবেন না এটা নিশ্চিত। পবিত্র কোর'আনে জাহান্নামের ঘোষণা রয়েছে কেবল কাফের-মোশরেক, মোনাফেকদের জন্য এবং জেহাদ ত্যাগকারী মোনাফেকদের জন্য তিনি ভয়াবহ আজাবের ঘোষণা দিয়েছেন (সুরা তওবা ৩৯)। কেউ শেরক-কুফর করলে আর জেহাদ ত্যাগ করলে সে আর মো'মেনের সংজ্ঞায় (সুরা হুজরাত ১৫) থাকে না। সালাহ, সওমসহ যে আমলগুলোকে আল্লাহ ফরদ করেছেন, সেগুলো মো'মেনের চরিত্র সৃষ্টির প্রশিক্ষণ হিসাবে দিয়েছেন। শুধু সওম না রাখলে জাহান্নাম দেওয়া হবে এমন সরাসরি কোনো আয়াত না থাকলেও মো'মেন যদি সওম না রাখে, আল্লাহর দেওয়া বাধ্যতামূলক এই ফরজ লংঘন করে, তাহলে তার চরিত্র সৃষ্টি হবে না। যে উদ্দেশ্যে সওম ফরজ করা হয়েছে, অর্থাৎ সংযম, সেটা

অর্জিত না হওয়ার ফলে তার আত্মিক অবনতি ঘটবে, সে স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক হবে যা মোমেনের সংজ্ঞার একেবারে বিপরীত। ফলে ইসলামের যে উদ্দেশ্য সেটাই তাদেরকে দিয়ে অর্জিত হবে না। কাজেই সওম ত্যাগ করা ইসলামের উদ্দেশ্যে পরিপন্থী। এটি একটি গুরুতর পাপ।

হাদিসটি থেকে আরেকটি শিক্ষা হচ্ছে সওম না রাখতে পারলে কাফফারা বা ফিদিয়া এমন যাতে সমাজ উপকৃত হয়, দারিদ্র্য দূর হয়। যেমন- দাসমুক্ত করা, দরিদ্রকে খাওয়ানো, সদকা দেওয়া ইত্যাদি। রমজান মাসে সদকা বা ফেতরা প্রদান করাও গুরুত্বপূর্ণ আমল যা মানুষের উপকারে আসে। এভাবে বিচার করলে দেখা যাবে ইসলামের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধি আনয়ন। বর্তমানে সওমের কাফফারা সম্বন্ধে প্রচলিত প্রসিদ্ধ ফতোয়া হচ্ছে তিনভাবে কাফফারা আদায় করা যায়, এক) একটি দাসমুক্ত করা, দুই) ৬০ জন মিসকিনকে দুই বেলা ভালোভাবে তৃপ্তিসহকারে আহার করানো, তিন) ধারাবাহিকভাবে ৬০টি সওম পালন করা। এই ৬০ টি সওম আবার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে পালন করতে হবে। এর মধ্যে কেউ যদি একটি সওম ভেঙে ফেলে তাহলে পুনরায় গোড়া থেকে শুরু করতে হবে এবং ৬০ টি সওমই আবার রাখতে হবে। বলা বাহুল্য, উল্লেখিত হাদিসটি থেকেই ফতোয়া নির্গত করা হয় (আল হিদায়াহ, ১ম খণ্ড, সিয়াম অধ্যায়)।

প্রশ্ন হচ্ছে, কাফফারা আদায়ের এমন কঠোর বিধান তো আল্লাহ বা আল্লাহর রসুল দেন নাই। মহানবীর (সা.) সাহাবিদের কারো জীবনে একটা সওম ভঙ্গের কাফফারা হিসাবে টানা দুই মাস সওম পালনের মত একটি নজিরও কেউ দেখাতে পারবেন না। কোর'আনে দুই মাস টানা সওম পালনের হুকুম রয়েছে অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো মো'মেন বান্দাকে হত্যার কাফফারা হিসাবে (সুরা নিসা ৯২), ইচ্ছাকৃতভাবে সওম ভাঙার জন্য নয়। উপরে বর্ণিত হাদিসটিতে আল্লাহর রসুল শুরুতে ওসব কাফফারার কথা উল্লেখ করলেও সেটা যে তাঁর অভিপ্রায় ছিল না, তা পরবর্তী কথোপকথনেই প্রকাশিত হয়ে যায়। তিনি যে রহমাতাল্লিল আলামিন তা প্রমাণিত হয় যখন তিনি উক্ত দরিদ্র সাহাবিকেই সদকার খেজুরগুলো পরিবার নিয়ে খাওয়ার জন্য দান করে দিলেন। পরবর্তীতে ইসলামকে ইচ্ছা করে কঠোর বানিয়ে ফেলেছেন ফকিহ ও মুফতিগণ যা সুস্পষ্ট বাড়াবাড়ি।

সওমের গুরুত্বের ওলট পালট

সওমের মাস আসলে যেভাবে ব্যাপক আয়োজন শুরু হয়, মনে হয় যেন সওমই ইসলামের একমাত্র কর্তব্য। গণমাধ্যমগুলো ক্রোড়পত্র বের করে, প্রতিদিন পত্রিকায় বিশেষ ফিচার, প্রবন্ধ ইত্যাদি লেখা শুরু হয়। টেলিভিশনে জাদরেল মওলানা, মৌলভীরা আলোচনার ঝড় তোলেন। কিছু ডাক্তার আসেন সওমের স্বাস্থ্যগত উপকারিতা বোঝাতে। সারারাত চলে হামদ ও নাত, শেষরাতে সেহেরি অনুষ্ঠান। সব মিলিয়ে বিরাট এক হুলুস্থুল পড়ে যায়। এটা অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য, কারণ ইসলামের একটি বিষয় যত বেশি আলোচিত হবে, সেটা মানুষের জীবনেও তত বেশি আচরিত হবে। কিন্তু প্রশ্ন হল যেখানে আল্লাহ কোর'আনে সওম ফরদ হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন মাত্র একবার (সুরা বাকারা ১৮৩) আর সওম পালনের নিয়ম কানুন উল্লেখ করেছেন পরবর্তী চারটি আয়াতে (সুরা বাকারা ১৮৪-১৮৭)। আর সত্যদীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম তথা জেহাদ ও কিতালের হুকুম প্রদান করা হয়েছে বহুবার, আর এর বিবরণ দেওয়া হয়েছে প্রায় পাঁচ শতাধিক আয়াতে। মো'মেনের সংজ্ঞার মধ্যেও আল্লাহ জেহাদকে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, 'মো'মেন শুধু তারাই যারা আল্লাহ ও রসুলের প্রতি ঈমান আনার পর আর সন্দেহ পোষণ করে না এবং সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করে (সুরা হুজরাত ১৫)।' এ সংজ্ঞাতে আল্লাহ সওমকে অন্তর্ভুক্ত করেন নাই, জেহাদকে করেছেন। শুধু তাই নয়, সওম পালন না করলে কেউ ইসলাম থেকে বহিষ্কার এ কথা আল্লাহ কোথাও বলেন নি, কিন্তু জেহাদ না করলে আল্লাহ কঠিন শাস্তি দিবেন এবং পুরো জাতিকে অন্য জাতির গোলামে পরিণত করবেন (সুরা তওবা ৩৯)।

আল্লাহ যে বিষয়টি একবার মাত্র করার হুকুম দিলেও সেটা অবশ্যই ফরদ ও গুরুত্বপূর্ণ কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে বিষয়টি একইভাবে ফরদ করা হল এবং সেই কাজের বিষয়ে শত শতবার বলা হল সেটির গুরুত্ব আর দুই তিনটি আয়াতে যে বিষয়টি বলা হল এই উভয় কাজের গুরুত্ব কি সমান? নিশ্চয়ই নয়। মহান আল্লাহ কোর'আনে শত শতবার জেহাদ কিতাল সম্পর্কে বলার পরও এ প্রসঙ্গে কেউ একটি শব্দও উচ্চারণ করেন না। মিডিয়াতে তো প্রশ্নই ওঠে না, এমন কি যে এমাম সাহেব মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে সিয়ামের ফজিলত নিয়ে সুরেলা ওয়াজে শ্রোতাদের মোহিত করেন, ভুলেও জেহাদের নাম উচ্চারণ করেন না। এর কারণ আকিদার বিকৃতি ও ভয়। এর কারণ কি? এর কারণ সওম অতি নিরাপদ একটি আমল যা করলে সুঁইয়ের খোঁচাও লাগার আশঙ্কা নেই। এতে জীবনের ঝুঁকি নেই, আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ারও সম্ভাবনা নেই, কোন কোরবানিরও প্রশ্ন নেই। পক্ষান্তরে জেহাদ এমন একটি কাজ যা করতে গেলে জীবন ও সম্পদের সম্পূর্ণ কোরবানি প্রয়োজন। আরেকটি কারণ হল আজকের, দুনিয়াময় যে ইসলাম চালু আছে এটা আল্লাহ ও রসুলের ইসলাম নয়। ব্রিটিশরা মাদ্রাসা বসিয়ে নিজেরা সিলেবাস কারিকুলাম তৈরি করে এই জাতিকে

যে বিকৃত ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে এটা সেই ইসলাম। এতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বা তওহীদ নেই, দীনুল হক প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম নেই, কোনো জাতীয় আইন-কানুন নেই, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি নেই; অর্থাৎ নামাজ, রোজা আর ব্যক্তিগত আমলসর্বস্ব অন্যান্য ধর্মের মতোই একটি ধর্মে পরিণত হয়েছে। এই ধর্মের পণ্ডিতদের, আলেমদের কাছে দীনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নামাজ, রোজা, দাড়ি, তারাবি, টুপি, টাখনু, মিলাদ, মেসওয়াক ইত্যাদি আর জেহাদ একেবারেই নিস্প্রয়োজন এবং অতীতের ঘটনা। এই হুকুম যেন আমাদের জন্য প্রযোজ্যই না। এজন্য তাদের এই ইসলাম একটি মৃত, আল্লাহর রসুলের ইসলামের বিপরীতমুখী ধর্ম। এই বিকৃত ধর্মের উপাসনা ও আনুষ্ঠানিকতাগুলো মানুষ পালন করে আল্লাহর কাছ থেকে বিনিময় ও জান্নাত পাওয়ার আশায়। পবিত্র রমজান মাসে এই সমস্ত আমলের প্রতিদান অন্য সব মাসের চেয়ে সত্তর গুণ হবে এই আশায় ধর্মপ্রাণ মানুষ ফরদ, ওয়াজিব, সুন্নাহ, নফল, মোস্তাহাব ইত্যাদি সর্বপ্রকার আমল প্রচুর পরিমাণে করে থাকেন এবং এর বিনিময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করছেন বলে পরিতৃপ্ত থাকেন। কিন্তু সেই আমল গৃহীত হবে কী করলে সেটা কেউ ভেবে দেখেন না। তওহীদহীন ইসলাম আল্লাহর কাছে গৃহীত নয় ফলে জাতিগতভাবে আমাদের মো'মেন থাকা নিয়েও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। আরেকটি মারাত্মক বিষয় হচ্ছে গুরুত্বের ওলটপালট। আল্লাহ এবং তাঁর রসুল যে বিষয়ের অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন, এই বিকৃত ইসলামে তাকে একেবারে গুরুত্বহীন করে ফেলা হয়েছে; পক্ষান্তরে আল্লাহ-রসুল যে কাজের গুরুত্ব দিয়েছেন কম, সেটিকে মহা গুরুত্বপূর্ণ বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

জেহাদ সংক্রান্ত আলোচনা না করায় কী ক্ষতি হচ্ছে?

জেহাদ সংক্রান্ত আলোচনা কোর'আন ও হাদিসের বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে। এটা নিয়ে যখন মিডিয়া, রাষ্ট্র এমনকি আলেম সমাজ, মসজিদের ইমামগণ প্রায় নিরব ভূমিকা পালন করেন তখন জেহাদের সঠিক আকিদা সাধারণ মানুষ জানতে পারে না। জেহাদ যে আসলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, জেহাদ এবং সন্ত্রাস যে ভিন্ন বিষয়, জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড ও জেহাদ যে সম্পূর্ণ বিপরীত- এ বিষয়গুলো সাধারণ মানুষের অজানাই থেকে যায়। এই অজ্ঞতার সুযোগই নেয় জঙ্গিরা। ধর্মপ্রাণ মানুষদেরকে জেহাদের আয়াত ও হাদিস দেখিয়ে নিজেদের দলে টেনে নেয়। তাদেরকে বোঝানো হয়- দেখ, দেখ জেহাদের কত গুরুত্ব, কত মাহাত্ম্য অথচ তোমার মসজিদের ইমাম তো কখনোই এই কথাগুলো তোমাকে শেখায়নি। তখন ধর্মপ্রাণ মানুষ এটাতে উদ্বুদ্ধ হয়। এজন্য সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষকে জেহাদ সংক্রান্ত আকিদা পরিষ্কার করা প্রয়োজন, তাদেরকে বোঝানো দরকার যে, জেহাদ এক বিষয় আর জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস অন্য বিষয়। কাজেই ইসলামে জেহাদ এর মানে কী, কেন জেহাদ করবে, কার বিরুদ্ধে করবে, কী দিয়ে করবে ইত্যাদি শিক্ষা ধর্মপ্রাণ মানুষকে দিতেই হবে। এটা এখন সময়ের দাবি।

তারাবির সালাতের গুরুত্ব কতটুকু?

তারাবি সালাহ আসলে কী, ইসলামে এর স্থান কোথায় তা নিয়ে বিস্তর মতভেদ আলেমদের মধ্যে আছে। কিছু সাধারণ সত্য মুসল্লিদের জানা থাকা প্রয়োজন। বর্তমানে সওমের মাসে প্রতি রাত্রে ২০ রাকাত তারাবির সালাতকে সওমের অপরিহার্য অঙ্গ মনে করা হয়, এমন ধারণা করা হয় যেন তারাবি না পড়লে সওমই হবে না, এমনকি কেউ যদি সওম নাও রাখে তবু তার তারাবি পড়া উচিত। তাই বাস্তবে দেখা যায়, যারা ফরদ সালাহর ব্যাপারে গাফেল, তারাও তারাবির ব্যাপারে সতর্ক। আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে, কোর'আনে বা হাদিসে তারাবি শব্দটিই নেই। আকিদার বিকৃতি ছাড়াও তারাবির এত গুরুত্ব দেওয়ার পেছনে হাফেজ সাহেবদের অর্থনৈতিক বিষয়টিই প্রধান। অথচ অনেক বড় বড় আলেম সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, অর্থের বিনিময়ে খতম তারাবি পড়ানো হারাম। সে মোতাবেক বিনা হাদিয়ায় তারাবি পড়ানোর একটি প্রচলন সমগ্র মুসলিম দুনিয়াতেই আছে।

তারাবি শব্দটি কোর'আন হাদিসের কোথাও নেই। নবী করিম (সা.) এর উপর যখন কোর'আন নাজিল হয়েছিল তখন ঐ সব আয়াত গাছের বাকলে, পাতায়, পাথরের উপরে, পশুর চামড়ায় ইত্যাদির মধ্যে লিখে রাখতে হতো, আজকের মতো মুদ্রণযন্ত্র ছিল না, কাগজে লেখার এত প্রচলন ছিল না। সারা বছর যা নাজেল হত হুজুর পাক (সা.) সেগুলো ঝালাই করতেন পবিত্র সওমের মাসে, কারণ সওমের মাসেই কোর'আন নাজেল হয়েছিল। এজন্য হুজুর (সা.) সওমের মাসে নির্দিষ্ট সময় ঠিক করতেন তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ থেকে ঐ সারা বছর যেগুলো নাজেল হয়েছে সেগুলোকে তিনি ঝালিয়ে নিতেন, যেন হারিয়ে না যায়। এতে হুজুরের (সা.) অনেক কষ্ট হত। প্রিয় হাবিবের কষ্ট দূর করার জন্য একদিন আল্লাহ আয়াত নাজেল করলেন, হে রসুল (সা.) আপনি আর কষ্ট করবেন না আমি এটা সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছি (সুরা আ'লা ৬, সুরা হিজর ৯, সুরা কেয়ামাহ ১৬-১৭)। তারপর থেকে রসুলাল্লাহ (সা.) ভারমুক্ত হন।

রসুলাল্লাহর (সা.) আসহাবদের অনেকেই সম্পূর্ণ কোর'আন কণ্ঠস্থ করে রাখতেন। যারা মুখস্থ করে রাখতেন অর্থাৎ হাফেজে কোর'আন, তারা যেন তা না ভুলে যান সেজন্য চর্চা অব্যাহত থাকত। কিন্তু বর্তমান যুগে বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি কোর'আন শরিফ, প্রায় প্রতিটি ভাষায় রয়েছে এর অনুবাদ। প্রত্যেক মুসলিম পরিবারে এক বা একাধিক কপি কোর'আন সযত্নে সংরক্ষিত রয়েছে। তথ্য প্রযুক্তির অগ্রগতির কারণে আল্লাহর রহমে কোর'আন হারিয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে, কোর'আন শরীফ আল্লাহর আদেশ-নিষেধের একটি গ্রন্থ। সেখানে যেমন ব্যক্তিগত জীবনের বিধান আছে, তেমনি আছে সামাজিক, অর্থনৈতিক, বিচারিক, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, জাতীয়, রাষ্ট্রীয় জীবনের বিধি-বিধান ও নীতিমালা। সেই সব আদেশ নিষেধকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করা হলে মানবজীবনে শৃঙ্খলা, ন্যায়, সুবিচার,

নিরাপত্তা এক কথায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন কোর'আন নাজিলের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে, এই আসমানি কেতাবের প্রকৃত হক আদায় করা হবে।

সেটা না করে আমরা যদি পাশ্চাত্য বস্তুবাদী 'সভ্যতা' দাজ্জালের তৈরি আইন-কানুন, অশালীন সংস্কৃতি, সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি, ব্রিটিশ দণ্ডবিধি তথা জীবনব্যবস্থা মেনে নিয়ে জীবন কাটাই, তাহলে রমজান মাসে তারাবির নামাজে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোর'আন তেলাওয়াত শোনার কোনো মানে থাকে না। যে আয়াতগুলো পড়া হচ্ছে, শোনা হচ্ছে, সেগুলো বাস্তবে কার্যকর নেই। সেগুলো কার্যকর করাই ছিল আয়াতগুলো প্রেরণের উদ্দেশ্য। বর্তমানে সে উদ্দেশ্যই ভুলে যাওয়া হয়েছে। তাই এ জাতীয় উদ্দেশ্যহীন আমল আমাদের আমলনামায় কোনো সওয়াব লেখাবে না। এখন মুখস্থ করার থেকে বেশি জরুরি হল একে প্রতিষ্ঠা করা।

তারাবি সম্পর্কে মাত্র তিন থেকে চারটি হাদিস পাওয়া যায়। গভীর রাতে রসুলাল্লাহ সব সময়ই অতিরিক্ত সালাহ করতেন, একে 'কিয়াম আল লাইল' বলা হয় যা বিশেষভাবে তাঁর জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। তিনি ব্যক্তিগত সালাহ কায়েমের জন্য মসজিদের নিকটেই একটি ছোট ঘর তৈরি করেছিলেন। রমজান মাসে তিনি এশার পর পরই নিজ গৃহে এই সালাহ কায়েম করে ফেলতেন এবং অন্যান্য সময়ের চেয়ে সালাহ দীর্ঘ করতেন। দীর্ঘ করার উদ্দেশ্য ছিল মূলত কোর'আনের মুখস্থ আয়াতগুলো ঝালিয়ে নেওয়া। একবার রমজান মাসে তিনি এশার পরে নফল সালাহ কায়েম করছেন। বাইরে থেকে তাঁর ক্বেরাতের আওয়াজ শুনে কয়েকজন সাহাবি ঘরের বাইরে দাঁড়িয়েই রসুলের (সা.) সাথে জামাতে শরীক হয়ে যান। পরদিন এই সংবাদ পেয়ে আরো বেশ কিছু সাহাবি আসেন রসুলের (সা.) সাথে সালাহ কায়েম করার জন্য। কিন্তু সেদিন আর রসুলাল্লাহ সালাতে দাঁড়ান না এবং ঘরের বাইরেও আসেন না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে আসহাবগণ উচ্চৈঃস্বরে রসুলাল্লাহকে ডাকতে থাকেন এবং তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ঘরের দরজায় ছোট ছোট পাথর ছুঁড়ে মারতে থাকেন। তাঁদের এ আচরণে রাগান্বিত হয়ে রসুলাল্লাহ বেরিয়ে এসে বলেন, 'তোমরা এখনও আমাকে জোর করছ? আমার আশঙ্কা হয় এই সালাহ তোমাদের জন্য আল্লাহ না ফরদ করে দেন। হে লোকসকল! তোমরা এই সালাহ নিজ নিজ ঘরে গিয়ে কায়েম কর। কারণ কেবলমাত্র ফরদ সালাহ ব্যতীত তোমাদের জন্য সর্বোত্তম সালাহ হচ্ছে সেই সালাহ যা নিজ গৃহে কায়েম করা হয়।' (যায়েদ বিন সাবিত রা. থেকে বোখারি)। আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি আয়েশা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করেন, রমজান মাসে রসুলাল্লাহর সালাহ কেমন ছিল। তিনি বলেন, রসুলাল্লাহ রমজান মাসে এবং অন্যান্য সময়ে রাতে এগারো রাকাতের বেশি সালাহ কায়েম করতেন না। তিনি চার রাকাত সালাহ করতেন, আবার চার রাকাত সালাহ করতেন (অর্থাৎ আট রাকাত), এবং তারপরে তিন রাকাত সালাহ (বেতর) করতেন (বোখারি)।

এরপর রসুলের জীবদ্দশায় জামাতে এই সালাহ আর কায়েম করার ইতিহাস নেই। প্রথম খলিফা আবু বকরের (রা.) সময়েও তারাবিহ সালাহ কায়েমের কোনো

নজির নেই। বলা হয়, উমর (রা.) তারাবির নামাজ চালু করেছেন। এর কারণ হল, তিনিই সর্বপ্রথম উবাই ইবনে কা'বের (রা.) পেছনে তারাবির জামাতের ব্যবস্থা করেছেন। আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারী (রহ.) বলেন, রমজানের এক রাতে উমরের (রা.) সঙ্গে বের হলাম। দেখি, লোকজন বিক্ষিপ্তভাবে ছোট ছোট জামাত করে নামাজ পড়ছে। কেউ একা একা পড়ছে আর কেউ ইমামতি করছে, কিছু লোক তার ইক্তিদা করছে। উমর (রা.) বললেন, মনে হচ্ছে, সবাইকে যদি এক ইমামের পিছনে জমা করিয়ে দিই তাহলে ভালো হবে। এরপর এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন এবং সবাইকে উবাই ইবনে কা'বের (রা.) পেছনে দাঁড় করিয়ে দেন।

আরেক রাতে তার সঙ্গে বের হলাম। লোকজন উবাই ইবনে কা'বের (রা.) পেছনে জামাতের সঙ্গে নামাজ পড়ছেন। উমর (রা.) তখন বললেন, এটা উত্তম বিদআত (বিদ'আতে হাসানা)। সাহাবায়ে কেরাম রাতের প্রথমাংশে (তারাবির) নামাজ পড়তেন। উমর (রা.) বললেন, এই নামাজ থেকে ওই নামাজ উত্তম, যার সময় তারা ঘুমিয়ে থাকে। অর্থাৎ শেষ রাতের নামাজ। (সহিহ বুখারি, হাদিস ২০১০, আলমুগনী, ইবনে কুদামা ২/১৬৬)।

সুতরাং বোঝা গেল যে, উমর (রা.) তারাবির সালাতকে বেদা'আত বলেছেন এবং শেষ রাতের তাহাজ্জুদের সালাতকেই তারাবির চেয়ে উত্তম বলে ঘোষণা করেছেন। তাহলে আজ এত গুরুত্বের সাথে প্রায় বাধ্যতামূলক তারাবি পড়ার প্রচলন হল কিভাবে? এর প্রকৃত কারণ হচ্ছে আকিদার বিকৃতি হয়ে ইসলামের ছোট বিষয়গুলোকে মহা গুরুত্বপূর্ণ করে ফেলা। আবার মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে একেবারে গায়েব করে দেওয়া যেমন তওহীদ, জেহাদ (সত্যদীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম), আইন-কানুন, অর্থনীতি, দণ্ডবিধি ইত্যাদি ব্যাপারে খবরও নেই, আগ্রহও নেই।

কোর'আন খতম ও তারাবিকেন্দ্রিক ধর্মব্যবসা

ধর্ম থেকে ত্যাগের শিক্ষাগুলো বিদায় নিয়েছে বহু আগে। সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম তথা জেহাদ করতে জীবন ও সম্পদ দুটোই ত্যাগ করা লাগে। তাই জেহাদও পরিত্যাগ করা হয়েছে বহু আগেই। কিন্তু রসুলাল্লাহ ও তাঁর সাহাবিরা জেহাদ করেছেন, কোর'আন ভর্তি আছে জেহাদের হুকুম। তাই সত্যিকার জেহাদের বিকল্প হিসাবে হাদিস প্রচার করা হয়েছে, আত্মার বিরুদ্ধে জেহাদই বড় জেহাদ। এই জেহাদ করতে হলে জীবন-সম্পদ আর ত্যাগ করার দরকার পড়ছে না। আনুষ্ঠানিকতা, আনন্দ-উপভোগের ক্ষেত্রগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ করে বাণিজ্যিক রূপ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন দুটো ঈদ। ৬০/৭০ টাকা ফেতরা দিয়েই মানুষ সমাজের দরিদ্র মানুষের প্রতি তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করতে পারছে আর নিজেরা লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ঈদ-আনন্দ উপভোগ করছে। দেশে কেনাকাটা করে না পোষালে বিদেশে গিয়ে কেনাকাটা করতে যায় বহু মানুষ। রমজান মাস মানে এখন আর আত্মসংযমের মাস নয়, বরং এ মাসে অধিকাংশ পরিবারে খাওয়াবাবদ ব্যয় বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। বাজারে দ্রব্যমূল্য আকাশচুম্বি হয়। এই মাসে খতম তারাবি পড়িয়ে হাফেজ সাহেবরা ভালো আয়-রোজগার করেন। ঈদুল আজহায় কোরবানি অর্থাৎ ত্যাগের নামে শুরু হয় বিত্ত প্রদর্শন আর গোশত খাওয়ার মহোৎসব। এগুলো ছাড়াও শবে বরাত, শবে মেরাজ ইত্যাদি দিবসগুলোও ধর্মীয় দিক থেকে অতি তাৎপর্যপূর্ণ বলে উপস্থাপন করা হয় এবং এই দিবসগুলোকে ঘিরে ওয়াজ মাহফিল, মিলাদ মাহফিল, বিভিন্ন ধরনের খানাপিনার আয়োজন ইত্যাদি বিবিধ কর্মসূচিকে ইবাদত হিসাবে উপস্থাপন করে ধর্মব্যবসার পথ সুগম করা হয়। আর বিভিন্ন পীরের অনুসারীদের বছরজুড়ে নানা ধরনের ওরস, দিবস পালনের তো কোনো শেষ নেই।

বর্তমানে খতম তারাবির ব্যাপক প্রচলন ঘটানো হয়েছে যার অন্যতম কারণ বাণিজ্যিক। এত বড় কথা কেন বলছি? কারণ প্রথমত আল্লাহর রসুল কখনও খতম তারাবি করেন নি, এটার নামও কোনোদিন শোনেন নি, হাদিসগ্রন্থে 'তারাবি' শব্দটিই নেই এটা নিয়ে সকল আলেমই একমত। তথাপি একে 'উত্তম বেদাত' হিসাবে সওমের অংশ হিসাবে দাঁড় করানো হয়েছে। কেন তা বিচার করার জন্য যে কারো সত্যনিষ্ঠ বিবেকই যথেষ্ট হবে। ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি, আয়াত গোপন করা ও এর বিনিময় গ্রহণ করাকে আল্লাহ কী প্রকারে হারাম করেছেন এবং এমন কারো অনুসরণ করার আদেশ করেছেন যিনি বিনিময় গ্রহণ করেন না এবং সঠিক পথপ্রাপ্ত। এবার আমরা দেখব কোর'আন খতম ও খতম তারাবির বিনিময়গ্রহণ সম্পর্কে হাদিস ও ফতোয়ার গ্রন্থগুলোতে কী সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়।

বিনিময় গ্রহণ সম্পর্কে রসুলাল্লাহর (সা.) সিদ্ধান্ত

১. বিশিষ্ট সাহাবি আবদুর রহমান ইবনে শিবল (রা.) বলেন, আমি রসুলাল্লাহকে বলতে শুনেছি যে, তোমরা কোর'আন পড় তবে তাতে বাড়াবাড়ি কোরো না এবং তার প্রতি বিরূপ হয়ো না। কোর'আনের বিনিময় ভক্ষণ কোরো না এবং এর দ্বারা সম্পদ কামনা কোরো না।'

জীবনের প্রতিটি বিষয়ের মতো কোর'আন পড়ার মধ্যেও রসুলাল্লাহ পরিমিতিবোধ বজায় রাখতে বলেছেন। কারণ দীর্ঘ সময় কোর'আন পাঠ করলে পাঠকারী ও শ্রোতা উভয়ের মধ্যেই বিরক্তিভাব বা ক্লান্তি বা অমনোযোগ চলে আসতে পারে যা কোর'আনের জন্য মর্যাদা হানিকর। তাই তিনি এই বাড়াবাড়িটা করতে নিষেধ করেছেন। পাশাপাশি কোর'আন পাঠের বিনিময় ভক্ষণ করতে, এমনকি মনে মনে সম্পদ কামনা করতেও নিষেধ করেছেন।

২. রসুলাল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে কেউ কোর'আন পড়ে সে যেন তা দিয়ে আল্লাহর কাছে চায়। এরপর এমন কিছু মানুষ আসবে যারা কোর'আন পড়ে তার বিনিময় মানুষের কাছে চাইবে।

৩. অর্থের বিনিময়ে কোর'আন খতমের যে ধারা আমাদের সমাজে চালু হয়েছে সে বিষয়ে রসুলাল্লাহর একটি ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেন, একদিন আমরা একদল লোক এক স্থানে সমবেত ছিলাম। আমাদের মধ্যে আরব, অনারব, কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ সকল শ্রেণির লোকই ছিল। এ অবস্থায় নবী করিম (সা.) আমাদের মধ্যে আগমন করে বললেন, 'তোমরা সৌভাগ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছ। তোমরা আল্লাহর কেতাব তেলাওয়াত করে থাক। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রসুল বর্তমান রয়েছেন। অদূর ভবিষ্যতে মানুষের নিকট এইরূপ এক যুগ আসবে যখন তীরের ফলক বা দণ্ড যেরূপ সরল ও সোজা করা হয়, লোকেরা কোর'আন তেলাওয়াতকে ঠিক সেইরূপ সরল ও সোজা করবে। তারা দ্রুত তেলাওয়াত করে নিজেদের পারিশ্রমিক আদায় করবে এবং এর জন্য তাদের বিলম্ব সহ্য হবে না।

বিনিময় গ্রহণ সম্পর্কে আসহাবে রসুল, তাবেয়ীন ও সলফে সালেহীনদের সিদ্ধান্তঃ

১. রসুলাল্লাহর সাহাবিরা তাই কখনোই কোর'আন পাঠ বা শিক্ষাদানের বিনিময় গ্রহণ করতেন না, একে আগুনের মতো ভয় করতেন। তারা সবসময় আশঙ্কায় থাকতেন যে কোনোভাবে ইসলামের কাজের বিনিময়ে সম্পদ গ্রহণ করে ফেলেন কিনা। কারণ তারা ইসলামের যাবতীয় কাজ করতেন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। পার্থিব জীবনযাপনের চাহিদা মেটাতে তারা হালাল পথে পরিশ্রম করে রোজগার করতেন। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। আব্দাল্লাহ ইবনে মা'কাল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এক রমজানে লোকদের নিয়ে তারাবি পড়ালেন। এরপর ঈদের

দিন উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ তাঁর কাছে এক জোড়া কাপড় এবং ৫০০ দিরহাম পাঠালেন। তখন তিনি কাপড় জোড়া এবং দিরহামগুলো এই বলে ফেরত দিলেন, আমরা কোর'আনের বিনিময় গ্রহণ করি না।

২. তাবেয়ী যাযান (রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি কোর'আন পড়ে মানুষ থেকে এর বিনিময় গ্রহণ করে, সে যখন হাশরের মাঠে উঠবে তখন তার চেহারায় কোনো গোশত থাকবে না, শুধু হাড্ডি থাকবে।

৩. বিখ্যাত সুফি সাধক খাজা শাদিদ আদ্দিন হুজায়ফা মিরআশি (রহ.) (মৃত্যু ২০৭ হিজরি) বলেন, 'আমাদের মধ্যে যদি দুটি স্বভাব না থাকত!' ইবনে আবি দারদা প্রশ্ন করলেন, 'সে দুটো কী কী?' তিনি বললেন, 'সুখের সময় যদি আমরা আল্লাহর অবাধ্য না হতাম! আর আমরা নিজেদের আমল দিয়ে যদি দুনিয়া কামাই না করতাম!" (হিলইয়াতুল আওলিয়াঃ ৩/৪৮২, আখবারুস সালাফ- আবু ইয়াহিয়া জাকারিয়া)

৪. বিখ্যাত সুফি সাধক বিশর বিন হারিস (রহ.) (১১০ হি. - ২২৭ হি.) বলেন, আমি ফুজাইল ইবনে ইয়াজকে বলতে শুনেছি, "দীন বেচে দুনিয়া ভোগ করার চাইতে আমার কাছে ঢোল-তবলা-বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে দুনিয়া ভোগ করা অধিক পছন্দনীয়।" (শুআবুল ঈমানঃ ৫/৩৫৭, আখবারুস সালাফ- আবু ইয়াহিয়া জাকারিয়া)।

৫. সাইদ বিন আমর (রহ.) বলেন, 'হাসান বসরি যখন হাদিসের দরসে বসতেন, তখন মানুষ তার জন্য হাদিয়া আনত। কিন্তু তিনি হাদিয়া ফিরিয়ে দিয়ে বলতেন, "যে ব্যক্তি এ মসনদে বসে কিছু গ্রহণ করে, তার জন্য আল্লাহর কাছে কোনো অংশ থাকবে না।" (ইমাম আহমদ কৃত আজ-জুহদঃ ২৪৫, আখবারুস সালাফ-আবু ইয়াহিয়া জাকারিয়া)।

৬. মুহাম্মদ বিন ইউসুফ ইসফাহানি (রহ.) সব সময় এক দোকানদারের কাছ থেকে তরকারি কিনতেন না। তিনি বলতেন, 'সব সময় একজনের কাছ থেকে তরকারি কিনতে গেলে তারা আমাকে চিনে ফেলবে; ফলে আমাকে সুবিধা বেশি দেবে। আর আমি নিজের দীন বেচে জীবন যাপন করতে চাই না। (হিলইয়াতুল আওলিয়াঃ ১৪/১১৪, আখবারুস সালাফ- আবু ইয়াহিয়া জাকারিয়া)

৭. আব্দুল্লাহ বিন মুহাইরিজ এক দোকানে এলেন। উদ্দেশ্য, কাপড় কিনবেন। দোকানদারকে এক লোক তখন বলল, 'ইনি ইবনে মুহাইরিজ। তার সাথে সুন্দর করে কেনা-বেচা করবে।' তখন ইবনে মুহাইরিজ রেগে গিয়ে দোকান থেকে বের হয়ে গেলেন আর বললেন, 'আমরা আমাদের পয়সা দিয়ে পণ্য কিনি, দীন বেচে নয়।' (সিফাতুস সাফওয়া, আখবারুস সালাফ- আবু ইয়াহিয়া জাকারিয়া)।

বিনিময় গ্রহণ সম্পর্কে ফকিহ ও ইমামদের সিদ্ধান্ত

এবার দেখা যাক ইসলামের বিশেষজ্ঞ ও ইমামগণ এই ব্যাপারে কী ফায়সালা দিয়েছেন। পূর্ববর্তী আলেম-ওলামাগণ এ বিষয়ে একমত যে, খতমে তারাবির বিনিময় দেওয়া-নেওয়া উভয়ই নাজায়েজ ও হারাম। হাদিয়া হিসেবে দিলেও জায়েজ হবে না।

১. হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, বিনিময় লেনদেন হয় এমন খতম তারাবি শরিয়তপরিপন্থী। এরূপ খতমের দ্বারা সওয়াবের অংশীদার হওয়া যাবে না বরং গোনাহের কারণ হবে।

২. দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠানটি উপমহাদেশে কোর'আন হেফজ করার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করছে। তাদের ফতোয়ার একটি গ্রহণযোগ্যতা আলেম সমাজে রয়েছে। এই দারুল উলুম কর্তৃক প্রদত্ত ফতোয়াতেও আমরা দেখি খতম তারাবির বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ না-জায়েজ। হযরত মুফতি আজিজুর রহমান (রহ.) বলেন, বিনিময় গ্রহণ করে কোর'আন শরিফ তেলাওয়াত করা জায়েজ নেই। যাদের নিয়তে দেওয়া-নেওয়া আছে, তাও বিনিময়ের হুকুমে হবে। এমতাবস্থায় শুধু তারাবি আদায় করাই ভালো। বিনিময়ের কোর'আন তেলাওয়াত না শোনা উত্তম। কিয়ামুল লাইলের সওয়াব শুধু তারাবি পড়লেই অর্জন হয়ে যাবে।

৩. তারাবিতে কোর'আন পড়ার বিনিময় গ্রহণ করা জায়েজ নেই। দানকারী এবং গ্রহণকারী উভয়েই গোনাহগার হবে। যদি বিনিময়বিহীন কোর'আন শোনানোর মতো হাফেজ পাওয়া না যায়, তবে ছোট ছোট সুরা দিয়ে তারাবি পড়ে নেওয়াই উত্তম।

৪. দেওবন্দি আন্দোলনের অন্যতম কাণ্ডারি হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (র.) স্বয়ং বলেছেন, তারাবিতে যে পবিত্র কোর'আন পড়ে এবং যে শোনে তাদের মধ্যে অর্থের বিনিময় হারাম। আমাদের দেশের অধিকাংশ কোর'আনে হাফেজগণই এই দারুল উলুম দেওবন্দের ভাবধারায় পরিচালিত কওমি মাদ্রাসার ছাত্র। তারা এই ফতোয়াগুলোর কতটুকু মূল্যায়ন করছেন?

৫. আহলে হাদিস মতাদর্শের একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব মাওলানা আব্দুল্লাহ অমৃতসরী লিখেছেন, বিনিময়ের মাধ্যমে তারাবিতে পবিত্র কোর'আন তিলাওয়াত করা বা বিনিময় নির্ধারণ করা সম্পূর্ণ হারাম। বরং এরূপ লোকের পেছনে তারাবিও হয় না।

৬. দারুল ইফতাহ ও দারুল উলুম দেওবন্দের ফতোয়া রয়েছে - যে হাফেজ সাহেব টাকার লোভে কোর'আন মজিদ শোনান তা শোনার চেয়ে যে সুরা তারাবি

আদায় করে তার মুক্তাদি হওয়া ভাল। যদি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোর'আন শোনানো হয় তাহলে ইমামের সওয়াব হবে না, মুক্তাদিরও সওয়াব হবে না।

৭. বিনিময় দিয়ে কোর'আন খতম শুনে তারাবি আদায় করার চেয়ে সুরা তারাবি আদায় করাকেই অনেক আলেম আমলের দিক থেকে উত্তম বলে ঘোষণা করেছেন। শায়েখ মুফতি মুহাম্মদ শফি (রহ.) বলেছেন, 'ছোট ছোট সুরা দিয়ে তারাবি পড়ে নিন। বিনিময় দিয়ে কোর'আন শুনবেন না। কারণ কোর'আন শোনানোর মাধ্যমে বিনিময় গ্রহণ করা জায়েজ নেই।

৮. বিনিময় নিয়ে তারাবি নামাজে ইমামতকারী ইমামের ব্যাপারে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা আব্দুর রহমান মোবারকপুরী (র.) বলেন, আমি বিনিময় নিয়ে নামাজ পড়ানোকে মাকরুহ মনে করি এবং আমার ভয় হয়, ওই সব লোকের নামাজ আবার পড়তে হবে কি না, যারা এমন ইমামের পেছনে নামাজ আদায় করেন। এরপর তিনি বলেন, আমার মত হল, বিনিময় গ্রহণ করা যাবে না।

৯. হযরত খলিল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.) বলেন, বিনিময় দিয়ে পবিত্র কোর'আন শোনা জায়েজ নয়। দানকারী এবং গ্রহণকারী উভয় গোনাহগার হবে।

১০. মুফতি কেফায়াতুল্লাহ (রহ.) বলেন, তারাবিতে পবিত্র কোর'আন শোনানোর বিনিময় গ্রহণ করা জায়েজ নেই।

১১. খেদমতের নামে নগদ টাকা বা কাপড়চোপড় ইত্যাদি দেওয়াও বিনিময়ের মধ্যে শামিল। বরং তা বিনিময় ধার্য করা থেকেও জঘন্য। কারণ তাতে দুটি গোনাহ একত্রিত হয়। একটি কোর'আনের বিনিময় গ্রহণের গোনাহ। দ্বিতীয়টি হল, যে বিনিময় হচ্ছে তা না জানার গোনাহ।

১২. বিশিষ্ট বেরলভি মুফতি আমজাদ আলী কাদেরী আজমী এক ফতোয়ায় লেখেন, বর্তমানে অধিক প্রচলন দেখা যায়, হাফেজ সাহেবকে বিনিময় দিয়ে তারাবি পড়া হয়- যা জায়েজ নেই। দানকারী ও গ্রহণকারী উভয়ই গোনাহগার হয়। এটুকু নেব বা এটুকু দেবে- এটিই শুধু বিনিময় নয়। বরং যদি জানা থাকে যে এখানে কিছু পাওয়া যায়, যদিও তা নির্দিষ্ট নয়, তা নাজায়েজ। কারণ জানা থাকাও শর্তকৃতের মতো।

১৩. লা-মাজহাবিদের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা আব্দুর রহমান মোবারকপুরী লেখেন, ইমাম আহদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর কাছে বিনিময় নিয়ে তারাবি নামাজে ইমামতকারী ইমামের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, সেরূপ ইমামের পেছনে কে বা কারা নামাজ আদায় করবে?

এই প্রবন্ধে আমরা কোর'আন, হাদিস ও প্রসিদ্ধ আলেমদের ফতোয়ার গ্রন্থ থেকে কিছু দলিল তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এ সমস্ত দলিল ও যুক্তিপ্রমাণের আলোকে যেন মুসলিম উম্মাহ সঠিকভাবে চিন্তা করার পথ খুঁজে পায় সেটাই এ লেখার উদ্দেশ্য। ঈদসহ অন্যান্য ধর্মীয় দিবসগুলো নিয়ে ধর্মবাণিজ্য করার কারণে দিবসগুলোর গাম্ভীর্য, পবিত্রতা, মাহাত্ম্য আজকে পুরোপুরিই ম্লান হয়ে গেছে। এটা করা হয়েছে স্বার্থের কারণে। একদিকে যেমন পণ্য ব্যবসায়ীরা দিবসগুলোকে ব্যবসায়িক স্বার্থে কাজে লাগাচ্ছে অপরদিকে ধর্মব্যবসায়ীরাও একই কাজ করছে।

একটি প্রাণঘাতী ভুলের চর্চা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে বলে সেটাকে অনন্তকাল চালিয়ে যেতে হবে এমন ধারণা থেকে আমাদের সবার বেরিয়ে আসা উচিত। ধর্মব্যবসা ধর্মের ধ্বংস ডেকে আনে, এই সরল কথাটি সকলেই জানেন ও বোঝেন। এখন প্রয়োজন ধর্মব্যবসার বিরুদ্ধে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ অবস্থান। তাহলেই আমরা আবার আমাদের হারানো গৌরবের দিন ফিরে পেতে পারি। মিথ্যার কালো পর্দাকে ছিন্ন করার পরেই সম্ভব হয় সত্যের আলোয় আলোকিত হওয়া।

সওম সম্পর্কে কোর'আন

ধর্মপ্রাণ মুসলমান মাত্রই জানেন, ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদী বিষয়ের পঞ্চম বিষয়টি হচ্ছে সওম বা রোজা। এর প্রথম চারটি মূলত সামষ্টিক বিষয় যা জাতিগতভাবে পালন করতে হয়। আর পঞ্চম আমলটি অর্থাৎ সওম হচ্ছে মুখ্যত ব্যক্তিগত আমল, যার প্রভাব ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয়ের উপরই পড়বে। দীনের প্রথম চারটি বুনিয়াদ সঠিকভাবে পালন করার জন্য যে আত্মিক এবং মানসিক চরিত্র প্রয়োজন সেই চরিত্র সৃষ্টির লক্ষ্যে আল্লাহ মুসলমানদের জন্য প্রশিক্ষণের একটা ব্যবস্থা করেছেন এই পঞ্চম আমলটির মধ্য দিয়ে। এ কারণে আল্লাহ বলেন, সওম আমার জন্য আর আমি এর পুরস্কার দিব (বোখারি-হাদিসে কুদসিঃ ১৯০৪)।

কোর'আনে কোন হুকুমটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং কোন হুকুমটি কম গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝার একটি উপায় হচ্ছে, যে বিষয়ে আল্লাহ যত বেশিবার বলেছেন, যত বেশি জোর দিয়েছেন সেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর যে বিষয়টি আল্লাহ কমবার বলেছেন সেটি অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের দুটো অংশ - ঈমান ও আমল। আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ মেনে নেওয়া হচ্ছে তওহীদ যা সব আমলের পূর্ব শর্ত। তাই তওহীদের কথা কোর'আনে এসেছে ৫৫৭ বার। বর্তমানে মুসলিম দাবিদার জাতিটি আল্লাহকে তাদের বিধানকর্তা (ইলাহ) হিসাবে মানছে না, ইলাহ মানছে পশ্চিমা সভ্যতাকে অর্থাৎ মানুষকে। তওহীদে না থাকলে কোনো আমল কবুল হয় না। তবু এই জনগোষ্ঠী তওহীদবিহীন আমল চালিয়ে যাচ্ছে, তওহীদে আসার যেন কোনো প্রয়োজন তাদের নেই। তওহীদের পরেই সবচেয়ে বেশিবার উল্লেখ করা

হয়েছে জেহাদ তথা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সম্পর্কে। এ প্রসঙ্গে সরাসরি আয়াত এসেছে ১৬৪টি এবং ব্যাখ্যামূলক আয়াত এসেছে আরো পাঁচ শতাধিক। বুনিয়াদি আমলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি এসেছে সালাত ১৪০ বার, জাকাত ৪২ বার, হজ ৩১ বার এবং সবশেষে সওম মাত্র ৪ বার।

সওম সম্পর্কে কোর'আনের একটি আয়াতে আল্লাহ সওমকে বাধ্যতামূলক করেছেন এবং পরবর্তী আরো তিনটি আয়াত যুক্ত করে সওম সম্পর্কে, এর প্রক্রিয়া ইত্যাদি বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও কোর'আনে বেশকিছু জায়গায় বিভিন্ন প্রসঙ্গেও সওম শব্দটি এসেছে। এ প্রবন্ধে আমরা সওম সম্পর্কে কোর'আনের সবগুলো আয়াত থেকে কী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি তা তুলে ধরছি।

১. হে মো'মেনগণ, তোমাদের উপর সিয়াম পালন বিধিবদ্ধ (ফরদ) করা হয়েছে, যেভাবে বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর (সুরা বাকারা -১৮৩)।

সওম কার জন্য ফরদ সেটা সুস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে আল্লাহর 'হে মো'মেনগণ' সম্বোধন থেকেই। মো'মেন না হয়ে সওম পালন করা তাই অর্থহীন। এই মো'মেন কাকে বলে সে সংজ্ঞা আল্লাহ দিচ্ছেন সুরা হুজরাতের ১৫ নম্বর আয়াত যেখানে আল্লাহ বলছেন, 'শুধুমাত্র তারাই মো'মেন যারা আল্লাহ ও রসুলের উপর ঈমান আনার পর আর কোনো সন্দেহ পোষণ করে না এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ (সর্বাত্মক সংগ্রাম) করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ।' যারা এই সংজ্ঞার আলোকে মো'মেন হবে তাদের জন্যই সওম পালনের নির্দেশ। কারণ এই সওম তাদের কর্তব্যকর্ম সম্পাদনে আবশ্যক চরিত্র দান করবে। সেই কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ ও আল্লাহর হুকুম দ্বারা মানুষকে শান্তিপূর্ণভাবে শাসন করা। এই দায়িত্ব পূর্বের সকল উম্মাহরও ছিল, যদিও তাদের কাজের ক্ষেত্র সমগ্র পৃথিবী ছিল না, সীমিত ছিল। তাই তাদের উপরও আল্লাহ সওম ফরদ করেছিলেন।

সওমকে এত গুরুত্ব আল্লাহ কেন দিলেন? সেই উদ্দেশ্য বুঝতে হলে আগে আমাদের জানতে হবে সওম অর্থ কী? সওমের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে বিরত হওয়া, দূরে থাকা, সংযম করা। মানুষ যেন সবসময় আল্লাহর আদেশ এবং নিষেধ মনে রেখে জীবনের পথ চলে সেই শিক্ষা পাওয়া যায় সওম থেকে। অর্থাৎ তাকওয়া অবলম্বন করে। একজন সওম পালনকারী নির্জন স্থানেও সামান্য পানি খেয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করে না, কারণ তার মনে এই বোধ জাগ্রত থাকে যে সে কোথাও আল্লাহর দৃষ্টির বাইরে নয়। সারাদিনের এই চর্চা তার চরিত্রে তাকওয়ার এই শিক্ষা গেঁথে দেয়। **এরপর পরই দুটো আয়াতে আল্লাহ বলছেন,**

২. নির্দিষ্ট কয়েক দিন (সওম পালন করতে হবে)। তবে তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ হবে, কিংবা সফরে থাকবে, তাহলে অন্যান্য দিনে সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আর যাদের জন্য তা কষ্টকর হবে, তাদের কর্তব্য ফিদইয়া- একজন দরিদ্রকে

খাবার প্রদান করা। অতএব যে স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত সৎকাজ করবে, তা তার জন্য কল্যাণকর হবে। আর সিয়াম পালন তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জান। (সুরা বাকারা - ১৮৪)

৩. রমজান মাস- যার মধ্যে কুরআন নাযিল করা হয়েছে লোকেদের পথ প্রদর্শক এবং হেদায়াতের সুস্পষ্ট বর্ণনারূপে এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে, কাজেই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে, সে যেন এ মাসে সওম পালন করে আর যে পীড়িত কিংবা সফরে আছে, সে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করবে, আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান, যা কষ্টদায়ক তা চান না যেন তোমরা মেয়াদ পূর্ণ করতে পার, আর তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করার কারণে তোমরা আল্লাহর মাহাত্ম্য ঘোষণা কর, আর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার। (সুরা বাকারা আয়াত - ১৮৫)

এই আয়াত দুটো খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আল্লাহ মো'মেনদের প্রতি কতটা রহমশীল, কতটা দয়াময় তা এ দুটো আয়াতেই স্পষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ মো'মেনদের কষ্ট দিতে চান না। তিনি চান তারা পরিশুদ্ধ হোক, তাকওয়া অর্জন করুক। এজন্য তিনি প্রয়োজনবশত ফরজ সওম ভাঙার ক্ষেত্রে যে ক্ষতিপুরণের ব্যবস্থা রেখেছেন সেটাও মো'মেনদের জন্য সহনশীল করে দিয়েছেন। যারা অসুস্থ থাকবে, যারা ভ্রমণে থাকবে তাদের জন্য সওম তিনি বাধ্যতামূলক করেন নি কারণ সেটা তাদের জন্য কষ্টকর হবে। আর যদি কেউ সওম পালন করতে না পারে তাহলে সে অন্যসময় বাকি থাকা সওমগুলো পূরণ করে নিবে এবং তার বিকল্প হিসেবে ফিদিয়া প্রদানের ব্যবস্থাও আল্লাহ রেখেছেন। সেটা হচ্ছে, দরিদ্র ব্যক্তিকে খাওয়ানো। এভাবে আল্লাহ একদিকে যেমন দরিদ্রের প্রতি দানের হস্ত প্রসারিত করাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, অপরদিকে চেয়েছেন মো'মেন যেন স্বেচ্ছায় সৎকাজে উদ্বুদ্ধ হয় এবং পরিশুদ্ধি অর্জন করে।

এর ঠিক এক আয়াত পরেই আল্লাহ বলছেন,

৪. সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের নিকট গমন হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের জন্য পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের জন্য পরিচ্ছদ। আল্লাহ জেনেছেন যে, তোমরা নিজেদের সাথে খিয়ানত করছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের তওবা কবুল করেছেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন। অতএব, এখন তোমরা তাদের সাথে মিলিত হও এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিখে দিয়েছেন, তা অনুসন্ধান কর। আর আহার কর ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কাল রেখা থেকে স্পষ্ট হয়। অতঃপর রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। আর তোমরা মাসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে মিলিত হইও না। এটা আল্লাহর সীমারেখা, সুতরাং তোমরা তার নিকটবর্তী হইও

না। এভাবেই আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ মানুষের জন্য স্পষ্ট করেন যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে। (সুরা বাকারা - ১৮৭)

এই আয়াতে আল্লাহ সওমের নিয়মগুলো স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যেন বিধান নিয়ে কোনো মতভেদ বা বাড়াবাড়ি করা না হয়।

এ আয়াতগুলো ছাড়াও সওম শব্দটি কোর'আনের আরো কিছু আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে:

৫. আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হজ ও 'উমরাহকে পূর্ণ কর, কিন্তু যদি তোমরা বাধাগ্রস্থ হও, তবে যা সম্ভব কুরবানী দিবে এবং কুরবানী যথাস্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত নিজেদের মস্তক মুণ্ডন কোরো না, তবে তোমাদের মধ্যে যে পীড়িত কিংবা মাথায় যন্ত্রণাগ্রস্থ, সে সওম কিংবা সাদকা বা কোরবানি দ্বারা ফিদইয়া দিবে এবং যখন তোমরা নিরাপদ থাক, তখন যে কেউ 'উমরাহকে হজের সঙ্গে মিলিয়ে উপকার লাভ করতে ইচ্ছুক, সে যেমন সম্ভব কোরবানি দিবে এবং যার পক্ষে সম্ভব না হয়, সে ব্যক্তি হজের দিনগুলোর মধ্যে তিনদিন এবং গৃহে ফেরার পর সাতদিন, এই মোট দশদিন সওম পালন করবে। এটা সেই লোকের জন্য, যার পরিবারবর্গ মাসজিদে হারামের বাসিন্দা নয়। আল্লাহকে ভয় কর আর জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর। (সুরা বাকারা- ১৯৬)

হজের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এখানে আল্লাহ বলছেন যে, কেউ আর্থিক কারণে কোরবানি করতে না পারে তবে সে সওম পালনের মাধ্যমে এর হক আদায় করবে। আবার অন্যত্র আল্লাহ বলছেন,

৬. কোন মুমিনের কাজ নয় অন্য মো'মেনকে হত্যা করা, তবে ভুলবশত হলে ভিন্ন কথা। যে ব্যক্তি ভুলক্রমে কোন মো'মেনকে হত্যা করবে, তাহলে একজন মো'মেন দাসকে মুক্ত করতে হবে এবং রক্তপণ দিতে হবে যা হস্তান্তর করা হবে তার পরিজনদের কাছে। তবে তারা যদি ক্ষমা করে দেয় তাহলে দিতে হবে না। আর সে যদি তোমাদের শত্রু কওমের হয় এবং সে মো'মেন, তাহলে একজন মো'মেন দাস মুক্ত করবে। আর যদি এমন কওমের হয় যাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সন্ধিচুক্তি রয়েছে তাহলে রক্তপণ দিতে হবে, যা হস্তান্তর করা হবে তার পরিবারের কাছে এবং একজন মো'মেন দাস মুক্ত করতে হবে। তবে যদি না পায় তাহলে একাধারে দু'মাস সিয়াম পালন করবে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমাস্বরূপ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় (সুরা নিসা - ৯২)।

অর্থাৎ কোন মো'মেন যদি ভুল করে অজ্ঞাতবশত কোন মো'মেনকে হত্যা করে তবে এই পাপ মোচনের জন্য সওম পালনের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে তওবা করবে। আত্মাকে পরিশুদ্ধ করবে। এখানেও পরিশুদ্ধতার জন্য, তাকওয়ার জন্য

অনন্যোপায় হলে আল্লাহ সওম পালনের নির্দেশ দিলেন এবং বললেন এটা তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমাস্বরূপ।

আরেকটি আয়াতে আল্লাহ সওম পালনকারীদের উল্লেখ করেছেন।

৭. নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও নারী, মো'মেন পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনয়াবনত পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, সিয়ামপালনকারী পুরুষ ও নারী, নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, তাদের জন্য আল্লাহ মাগফিরাত ও মহান প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন। (সুরা আহযাব -৩৫)

অর্থাৎ এখানেও সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের, আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম একটা মাধ্যম হচ্ছে সওম। এজন্যই সওম পালনকারী মো'মেন-মো'মেনাদের প্রতি আল্লাহ মাগফিরাত, সন্তুষ্টি এবং তাঁর প্রতিদানের ঘোষণা দিয়েছেন।

প্রবন্ধটি শেষ করার আগে, সওম সংক্রান্ত কোর'আনের সবগুলো আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে তার শিক্ষাগুলো পাচ্ছি সেগুলো একনজরে তুলে ধরছি-

১. মো'মেনদের তাকওয়া অর্জনের, আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জনের, চরিত্র গঠনের একটি মাধ্যম হচ্ছে সওম।

২. সওম মো'মেনকে আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে চলতে এবং সীমালঙ্ঘন না করতে শিক্ষা দেয়।

৩. আল্লাহ মো'মেনদেরকে কষ্ট দিতে চান না। তাই তিনি মো'মেনদের জন্য সহজ হয়, সহনশীল হয় এমন নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। কোন বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং বোঝা যায়, দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি করে জীবনে কঠিনতা আরোপ করা ইসলামের নীতিবিরুদ্ধ কাজ।

৪. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের, আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম একটা মাধ্যম হচ্ছে সওম। তাই মনের অজান্তেই কোনো ভুল করে ফেললে তা মোচনের জন্য আল্লাহ সওমের ব্যবস্থা রেখেছেন।

৫. সওম পালনকারী আল্লাহর ক্ষমা, সন্তুষ্টি এবং প্রতিদান লাভ করবে বলে আল্লাহ অঙ্গীকার করেছেন।

হেদায়াহ ও তাকওয়ার পার্থক্য কী?

সওম ব্যক্তিগত চারিত্রিক পরিশুদ্ধির জন্য আল্লাহর নির্দেশিত পন্থা। এর মাধ্যমে একজন মো'মেন তাকওয়া অর্জন করতে পারে। কিন্তু তাকওয়া কখনও জান্নাতে যাওয়ার শর্ত নয় যা আমরা পূর্বে বলে এসেছি। জান্নাতের পূর্বশর্ত হচ্ছে আল্লাহর পাঠানো হেদায়াহ মোতাবেক পথ চলা। যখন আল্লাহ বাবা আদম (আ.) ও মা হাওয়াকে তাদের কৃতকর্মের কারণে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন তখন তিনি বলেছিলেন, 'আমি হুকুম করলাম, তোমরা সবাই নীচে নেমে যাও। অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন হেদায়েত পৌঁছে, তবে যে ব্যক্তি আমার সে হেদায়েত অনুসারে চলবে, তার উপর না কোন ভয় আসবে, না কোনো কারণে তারা চিন্তাগ্রস্ত ও সন্তপ্ত হবে (সুরা বাকারা ৩৮)'। কী এই হেদায়াহ? তাকওয়া ও হেদায়ার পার্থক্যই বা কী?

কোর'আনে হেদায়াহ ও তাকওয়া এই দুটো পরিভাষা বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। হেদায়াহ ও তাকওয়া দু'টো সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় হলেও আজকের বিকৃত আকিদায় দুটোকেই সমার্থক বানিয়ে ফেলা হয়েছে। তাই কোনো গুণ্ডা প্রকৃতির অসৎ ব্যক্তি যদি নামাজ রোজা শুরু করে, গুণ্ডামি পরিহার করে তখন আমরা বলি যে লোকটা হেদায়াত পেয়েছে। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল, লোকটা হেদায়াত পায় নি, সে তাকওয়া অর্জন করেছে বা মুত্তাকি হয়েছে।

তাকওয়া আরবি শব্দের অর্থ বিরত থাকা, বেঁচে থাকা, নিষ্কৃতি লাভ করা, ভয় করা, নিজেকে রক্ষা করা, সাবধানে জীবনের পথ চলা। অর্থাৎ জীবনের পথ চলায় ন্যায়-অন্যায়, ঠিক-অঠিক দেখে চলা, অসৎ কাজ পরিহার করে সৎ কাজ করে চলা। কোর'আনের অনুবাদগুলোতে তাকওয়া শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে, 'আল্লাহভীতি' দিয়ে, ইংরেজিতে Fear of God দিয়ে। তাতে প্রকৃত অর্থ প্রকাশ পায় না। ইংরেজি অনুবাদে আল্লামা ইউসুফ আলী অনুবাদ করেছেন Fear of God বলে এবং মোহাম্মদ মারমাডিউক পিকথল করেছেন Mindful of duty to Allah অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে চেতনা বলে। প্রকৃতপক্ষে তাকওয়া শব্দের মর্ম হল আল্লাহ ন্যায়-অন্যায়ের যে মাপকাঠি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, সেই মাপকাঠি মোতাবেক জীবনের পথ চলা। যারা অমন সাবধানতার সঙ্গে পথ চলেন তাদের বলা হয় মুত্তাকি।

তাকওয়া ও হেদায়াত দু'টো আলাদা বিষয়। তাকওয়া হচ্ছে সাবধানে পথ চলা আর হেদায়াত হচ্ছে সঠিক পথে চলা। আপনি আপনার গন্তব্য স্থানের দিকে দু'ভাবে যেতে পারেন। এক, অতি সাবধানে পথের কাদা, নোংরা জিনিস এড়িয়ে, গর্ত থাকলে গর্তে পা না দিয়ে, কাঁটার উপর পা না ফেলে চলতে পারেন। ওভাবে চললে আপনার গায়ে ময়লা লাগবে না, আছড়ে পড়ে কাপড়ে কাদামাটি লাগবে না। দুই, পথের ময়লা, গর্ত, কাঁটা ইত্যাদির কোন পরওয়া না করে সোজা চলে

যেতে পারেন। ওভাবে গেলে আপনি আছাড় খাবেন, গায়ে-কাপড়ে ময়লা কাদামাটি লাগবে। আর হেদায়াত হচ্ছে আপনি এ উভয়ভাবের যে কোনও ভাবেই যে পথে চলছেন সে পথটি সঠিক হওয়া। পথ যদি সঠিক না হয়ে থাকে অর্থাৎ হেদায়াত না থাকে তবে আপনার শত সাবধানে পথ চলা অর্থাৎ শত তাকওয়া সম্পূর্ণ বিফল, কারণ আপনি আপনার গন্তব্যস্থানে পৌঁছবেন না। আর যদি সঠিক পথে অর্থাৎ হেদায়াতে থাকেন তবে তাকওয়া না করেও গায়ের কাপড়ে কাদামাটি লাগিয়ে আপনি আপনার গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যাবেন আপনি সফলকাম হবেন। অর্থাৎ তাকওয়া অর্থহীন যদি হেদায়াহ না থাকে এবং সেই হেদায়াত, সঠিক পথটি হল সেরাতুল মোস্তাকীম, সহজ সরল পথ, জীবনের কোন ক্ষেত্রে এক আল্লাহ ছাড়া কারো আদেশ না মানা, তওহীদ। এ জন্যই রসুলাল্লাহ (দ.) মোয়ায (রা.) কে বললেন, 'মোয়ায! কোন লোক যদি মৃত্যু পর্যন্ত এক আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে এলাহ (হুকুমদাতা, প্রভু) বলে স্থান না দেয়, তবে জাহান্নামের আগুন তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।' তারপর আবু যর (রা.)-কে বললেন, যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন প্রভু স্বীকার না করে তবে সে ব্যভিচার করলেও, চুরি করলেও, জান্নাতে প্রবেশ করবে (বোখারি ও মুসলিম)। অর্থাৎ ঐ লোক সঠিক পথে সেরাতুল মোস্তাকীমে আছে, হেদায়াতে আছে, কিন্তু তাকওয়ায় নেই, সে মুত্তাকি নয়। সে সঠিক পথে আছে বলে সে গায়ে কাদামাটি ময়লা নিয়েও তার গন্তব্য স্থানে, 'জান্নাতে' পৌঁছবে আর যারা অতি সাবধানে পথ চলছেন অতি মুত্তাকি কিন্তু সেরাতুল মোস্তাকীমে হেদায়াতে নেই তাদের সম্বন্ধেও আল্লাহর রসুল (দ.) বলে গেলেন। বলেছেন, 'ভবিষ্যতে এমন সময় আসছে, যখন মানুষ সওম রাখবে কিন্তু তা উপবাস অর্থাৎ না খেয়ে থাকা হবে (রোজা হবে না), রাত্রে ওঠে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়বে কিন্তু শুধু তাদের ঘুম নষ্ট করা হবে (নামাজ হবে না)'।

রসুলাল্লাহ যে সময়টার কথা বলে গেছেন এখন সেই সময়। বর্তমান মুসলিম দুনিয়ার যে উল্লেখযোগ্য অংশটা অতি মুত্তাকি সেটার শুধু ব্যক্তিগত জীবন ছাড়া আর সবটাই অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই আল্লাহকে বাদ দিয়ে মানুষের তৈরি ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োগ করা হয়েছে, অর্থাৎ তওহীদে সেরাতুল মোস্তাকীমে দীনুল কাইয়্যেমাতে 'হেদায়াতে' নেই। আদম (আ.) থেকে বিশ্বনবী (দ.) পর্যন্ত ইসলামের ভিত্তিই হল তওহীদ, সেরাতুল মোস্তাকীম, দীনুল কাইয়্যেমা। সেখানেই যদি না থাকে তবে আর ইসলামে রইল কেমন করে? কাজেই গোনাহ সওয়াব দেখে দেখে অতি সাবধানে তাকওয়ার সাথে পথ চললেও সেই পথ তাদের জান্নাতে নিয়ে যাচ্ছে না, নিয়ে যাচ্ছে জাহান্নামে।

সুরা ফাতেহার পর সুরা বাকারা দিয়ে কোর'আন আরম্ভ করেই আল্লাহ বলছেন, 'এই বই সন্দেহাতীত।' (এটা) মুত্তাকিদের (সাবধানে পথ চলার মানুষদের) জন্য হেদায়াহ (সঠিক পথ প্রদর্শনকারী)' (সুরা আল-বাকারা ২)। পরিষ্কার দু'টো আলাদা

জিনিস হয়ে গেল। একটি তাকওয়া অন্যটি হেদায়াহ। কাজেই আল্লাহ বলছেন, যারা মুত্তাকি, কিন্তু হেদায়াতে নেই- সঠিক পথে নেই, তাদের পথ দেখাবার জন্যই এই কোর'আন। অন্যান্য ধর্মে, এমন কি আল্লাহকে অবিশ্বাসকারী নাস্তিক কমিউনিস্টদের মধ্যেও বহু মানুষ আছেন যারা সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, ঠিক-অঠিক দেখে জীবনের পথ চলতে চেষ্টা করেন। তারা মিথ্যা বলেন না, মানুষকে ঠকান না, অন্যের ক্ষতি করেন না, যতটুকু পারেন অন্যের ভালো করেন, গরীবকে সাহায্য করেন ইত্যাদি। তাকওয়াবান ব্যক্তিদের কিছু গুণ তাদের মধ্যে আছে কিন্তু তারা হেদায়াতে নেই। তাদের হেদায়াতে অর্থাৎ তওহীদে আনার জন্য কোর'আন।

সুরা বাকারা ছাড়াও অন্যত্রও তাকওয়া ও হেদায়াত যে দু'টো ভিন্ন বিষয় তা আল্লাহ পরিষ্কার করে দিয়েছেন। তিনি বলছেন- যারা সঠিক পথে (হেদায়াতে) চলে (আল্লাহ) তাদের হেদায়াত বৃদ্ধি করেন ও তাদের তাকওয়া প্রদান করেন (সুরা মোহাম্মদ ১৭)। এই আয়াতেও তাকওয়া ও হেদায়াহ যে এক নয়, আলাদা তা দেখা গেল এবং হেদায়াত তাকওয়ার পূর্বশর্ত (Pre-condition) তাও পরিষ্কার হয়ে গেল। তাকওয়া ও হেদায়াহ যে এক নয় তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হচ্ছে সুরা আল ফাতাহ'র ২য় আয়াতে আল্লাহ তাঁর রসুলকে বলেছেন, আমি তোমাকে সেরাতুল মোস্তাকীমে হেদায়াত করেছি'। তারপর সুরা দুহার ৭ম আয়াতে বলছেন, 'তোমাকে হেদায়াত করেছি।' বর্তমানে প্রচলিত ভুল আকিদায় মুত্তাকি হওয়া মানেই যদি হেদায়াত হওয়া হয় তবে বিশ্বনবীর (দ.) চেয়ে বড় মুত্তাকি কে ছিলেন, আছেন বা হবেন? আল্লাহ নবুয়াত দেবার আগেও যার গোনাহ, পাপ ছিল না তাকে আবার হেদায়াত করার দরকার কি? বর্তমান পৃথিবীর মুসলিম জাতির একটা বড় অংশ প্রচণ্ড তাকওয়ায় আপ্রাণ চেষ্টা করছেন আল্লাহকে খুশি করার জন্য, তাঁর সান্নিধ্য ও জান্নাত লাভ করার জন্য, কিন্তু চলছেন আল্লাহ ও রসুল (দ.) প্রদর্শিত পথের (হেদায়াত) বিপরীতে। সে পথ অবশ্যই জাহান্নামের পথ। তারা ওয়াজ করছেন- অমুক কাজ করলে এত হাজার সওয়াব লেখা হয়; অমুক কাজ করলে এত লাখ সওয়াব লেখা হয়। তারা হাওলা দিচ্ছেন যে এসব কথা হাদিসে আছে। হাদিসে ঠিকই আছে। কিন্তু আকিদার বিকৃতিতে তারা বুঝছেন না যে ওগুলো যাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যারা সেরাতুল মোস্তাকীমে আছেন, সঠিক পথে আছেন তাদের জন্য। যারা উল্টোপথে আছেন বিপরীত দিকে চলছেন তাদের জন্য নয়। এই দীনের কঠিনতম দু'টি এবাদত রোজা ও তাহাজ্জুদই যদি তাদের জন্য অর্থহীন হয় তবে ওসব ছোটখাট ব্যাপারগুলো তো প্রশ্নের অতীত। আল্লাহর রসুল (দ.) জানতেন যে আকিদা ভ্রষ্ট হয়ে তাঁর উম্মাহ একদিন আল্লাহ ও তাঁর প্রদর্শিত দিক-নির্দেশনা থেকে বিচ্যুত হয়ে উল্টো দিকে চলতে থাকবে। সেদিন অনেক আগেই এসে গেছে। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন 'এমন সময় আসবে যখন মসজিদগুলো মুসল্লি দিয়ে পূর্ণ হবে' এমন কি একটি হাদিসে আছে যে, 'এমন পূর্ণ হবে যে সেগুলোতে জায়গা পাওয়া যাবে না, (আজকাল তাই হয়েছে) কিন্তু সেখানে

হেদায়াত থাকবে না।' লক্ষ্য করুন মহানবী (দ.) কোন শব্দটা ব্যবহার করলেন। তিনি তাকওয়া শব্দ ব্যবহার করলেন না, ব্যবহার করলেন হেদায়াত। অর্থাৎ তাকওয়া থাকবে, কারণ তাকওয়া না থাকলে তো আর মসজিদ পূর্ণ হতো না, কিন্তু হেদায়াত থাকবে না (আলী রা. থেকে বায়হাকি, মেশকাত)। মহানবীর (দ.) ভবিষ্যদ্বাণী বহু আগেই পূর্ণতা লাভ করেছে।

তারপর লক্ষ করুন সেই ঘটনাটির দিকে- একজন লোকের জানাযার নামাজ পড়ার জন্য লোকজন সমবেত হলে রসুলাল্লাহ সেখানে এলেন। ওমর (রা.) বিন খাত্তাব বললেন– ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনি এর জানাযার নামাজ পড়াবেন না। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, ঐ লোকটি অত্যন্ত খারাপ প্রকৃতির দুস্কৃতকারী লোক ছিলেন। শুনে বিশ্বনবী সমবেত জনতার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন- তোমাদের মধ্যে কেউ এই লোকটিকে কখনও ইসলামের কোনো কাজ করতে দেখেছ? একজন লোক বললেন- ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি একে একবার আল্লাহর রাস্তায় (জেহাদে) একরাত্রি (অন্য একটি হাদিসে অর্ধেক রাত্রি) পাহারা দিতে দেখেছি। এই কথা শুনে মহানবী ঐ মৃত ব্যক্তির জানাযার নামাজ পড়ালেন, তাকে দাফন করার পর, (তাকে উদ্দেশ্য করে) বললেন তোমার সঙ্গীরা মনে করছে তুমি আগুনের অধিবাসী (জাহান্নামী), কিন্তু আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তুমি জান্নাতের অধিবাসী (হাদিস- ইবনে আয়াজ (রা.) থেকে বায়হাকী, মেশকাত)।

ইসলামের প্রকৃত আকিদা বুঝতে গেলে এই দুইটি হাদিস গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। ওমর (র.) যখন রসুলাল্লাহকে বললেন যে ঐ মৃত লোকটি অত্যন্ত খারাপ লোক ছিলেন তখন সমস্ত লোকজন থেকে কেউ ও কথার আপত্তি করলেন না, অর্থাৎ ওমরের (রা.) ঐ কথায় সবাই একমত। কারণ হাদিসের ব্যাখ্যাকারীগণ বলেছেন ঐ মৃত লোকটি ডাকাত ছিলেন। তারপর মহানবী যখন সমবেত লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলেন তাদের মধ্যে কেউ ঐ মৃত লোকটিকে কোনোদিন ইসলামের কোনো কাজ করতে দেখেছেন কিনা তখন ঐ একমাত্র লোক ছাড়া আর কেউ কিছু বলতে পারলেন না। বিশ্বনবী বলেছিলেন ইসলামের কোনো কাজ, শব্দ ব্যবহার করেছিলেন- আমলেল ইসলাম। ইসলামের আমল অবশ্যই সালাত, জাকাত, হজ, সওম ইত্যাদি আরও বহুবিধ ফরজ, ওয়াজেব, সুন্নত, নফল ইত্যাদি। একটি দুশ্চরিত্র ঘৃণিত ডাকাত যাকে কেউ কোনোদিন কোনো এবাদত করতে দেখে নি, শুধুমাত্র জেহাদে যেয়ে অর্ধেক রাত্রি মুসলিম শিবির পাহারা দেয়ার জন্যই আল্লাহর রসুল প্রকাশ্যে ঘোষণা দিলেন যে ঐ লোক জান্নাতী এবং তিনি স্বয়ং সে ব্যাপারে সাক্ষী। কেন? এই জন্য যে, মানব জীবনের সমস্ত অন্যায় অবিচার মুছে ফেলে, আল্লাহকে ইবলিসের চ্যালেঞ্জে জয়ী করাবার জন্য সংগ্রামে নেমেছিলেন, ঐ লোকটি তাদের সঙ্গে ছিলেন এবং অর্ধেক রাত্রি ঐ যোদ্ধাদের শিবির পাহারা দেওয়ার মত সামান্য কাজ করেছিলেন।

অতএব, লোকটির তাকওয়ার অভাব থাকলেও তার হেদায়াত অর্থাৎ পথ ভুল ছিল না, সেটা সঠিক ছিল।

নুবয়াত শেষ হয়ে গেছে। এই উল্টো পথে চলা জাতিকে আবার উল্টিয়ে সঠিক পথে কে আনবে? শেষনবী (দ.) বলে গেছেন একজন মাহদী আসবেন ঐ কাজ করার জন্য। মাহদী শব্দটি এসেছে হেদায়াত থেকে- যিনি হেদায়াত প্রাপ্ত এবং হেদায়াতকারী; সত্যপথপ্রাপ্ত এবং সত্যপথ প্রদর্শনকারী। শেষনবী (দ.) ভবিষ্যতের সেই মানুষটির উপাধি ও বিশেষণে বললেন 'মাহদী' তিনি বললেন না যে মুত্তাকি আসবেন। কারণ মুত্তাকি আমরা যথেষ্ট, একেবারে চুলচেরা ব্যাপারেও আমরা প্রচণ্ড মুত্তাকি। আমাদের নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাত, দাড়ি, মোচ, পাগড়ি, পাজামা, খাওয়া-দাওয়া, তসবিহ যিকরে ভুল ধরে কার সাধ্য? কিন্তু চলছি সেরাতুল মোস্তাকীমের, দীনুল কাইয়্যেমার ঠিক বিপরীত দিকে, সংগ্রামের বিপরীত দিকে, গর্তের দিকে, পলায়নের দিকে, জাহান্নামের ভয়াবহ আযাবের দিকে। যিনি আমাদের এই জাহান্নামের দিকে গতি উল্টিয়ে আবার জান্নাতের দিকে করবেন অর্থাৎ হেদায়াত করবেন তাঁর উপাধি, বিশেষণ হচ্ছে মাহদী (আ.)।

পথ যদি ভুল হয় তাহলে গন্তব্যে কখনো পৌঁছানো যাবে না। এই সঠিক পথই হল হেদায়াহ। আজ ইসলামের নাম করে বহুজন বহুভাবে আমল করছে। কিন্তু পথ ভুল হওয়ার কারণে সেই সব আমল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে। এজন্যই মহানবী (সা.) বলেছিলেন, সময় আসবে যখন ইসলাম শুধু নাম থাকবে, কোর'আন শুধু অক্ষর থাকবে, মসজিদসমূহ হবে জাঁকজমকপূর্ণ ও লোকে লোকারণ্য, কিন্তু সেখানে হেদায়াত থাকবে না। সে সময় আসমানের নিচে নিকৃষ্ট জীব হবে আমার উম্মাহর আলেম সমাজ। তারা ফেতনা সৃষ্টি করবে এবং তাদের ফেতনা তাদের দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে (হাদিস- আলী রা. থেকে বায়হাকি, মেশকাত)।

সওম সংক্রান্ত জরুরি মাসলা-মাসায়েল

ইসলামকে আল্লাহ বলেছেন সহজ-সরল বা সিরাতুল মুস্তাকিম। পৃথিবীর সুস্থ মস্তিষ্কের প্রতিটি মানুষ এই দীন বুঝতে ও পালন করতে পারবে, এমনটাই এ দীনের দাবি। আল্লাহ মানুষকে উদার আহ্বান জানিয়েছেন, 'আর অবশ্যই আমরা কোর'আনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?' (সুরা দুখান ৫৮, সুরা কামার ১৭, ২২, ৩২, ৪০, ৫১)। আল্লাহর রসুলের যুগের আরবের মানুষ এখনকার মত জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর ছিল না। ঐতিহাসিকদের মতে, মহানবীর জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণকারী সাড়ে পাঁচ লক্ষ আরব জনগোষ্ঠীর মধ্যে খুব বেশি হলে চল্লিশজন মানুষ লিখতে পড়তে পারতেন। অন্যরা ছিলেন উম্মী, নিরক্ষর, কেউ লিখতে পড়তে পারতেন না। অথচ তারাও দীনের প্রতিটি বিষয় বুঝতে ও পালন করতে সক্ষম ছিলেন। এই দীন পালন সহজ বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। তখন মুসলিমদের মধ্যে আলেম শ্রেণি ও ধর্মীয় বিষয়ে অজ্ঞ জনতা- এ জাতীয় শ্রেণিভেদ ছিল না। শরিয়তের আদেশ-নিষেধ ও বিধানাবলির মধ্যেও ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, নফল, মুস্তাহাব ইত্যাদি স্তরভেদ ছিল না। কিন্তু বিগত তেরশো বছরে আলেম, ইমাম, ফকিহ, মুফাসসির, মুহাদ্দিস, মুজতাহিদ, মুফতিগণ দীনের চুলচেরা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে করতে শরিয়তের প্রতিটি বিষয়কে জটিল, কঠিন ও দুর্বোধ্য বানিয়ে ফেলেছেন। দীনের প্রত্যেকটি শরিয়ত নিয়ে তৈরি করেছেন শত-সহস্র মাসলা-মাসায়েল। আমিন জোরে বলা হবে না আস্তে বলা হবে, দাড়ি টুপির আকৃতি কেমন হবে, মিলাদের সময় দাঁড়াতে হবে না বসে থাকতে হবে, আল্লাহর রসুল কি মাটির তৈরি নাকি নূরের তৈরি, এইসব অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে মতপার্থক্য করে তারা তৈরি করেছেন বহু মাজহাব, ফেরকা, দল, উপদল। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, একজন মানুষের জীবদ্দশায় হাজার হাজার ইলমুল হাদিস, আকাইদ, তাফসির, ফিকাহ, উসুলে ফিকাহ, ফতোয়ার কেতাব অধ্যয়ন করে সেসব জটিল সূক্ষ্ম মাসলা মাসায়েলের জ্ঞান অর্জন করাও সম্ভব নয়, পালন করা দূরের কথা। কেউ যদি সমস্ত মাজহাবের ফিকাহ ও মাসলা মাসায়েলের কেতাব অধ্যয়ন করে, মুফতিদের কাছে জিজ্ঞাসা করে শরিয়তের কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চান তার কী অবস্থা হবে এ বিষয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় সংস্কারক, মুহাদ্দিস, লেখক, ধর্মতত্ত্ববিদ শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (১৭০৩-১৭৬২ খ্রিষ্টাব্দ) তাঁর 'মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়' গ্রন্থে লিখেছেন, "এমতাবস্থায় তিনি যদি সকল মাযহাবের ফিকাহর যাচাই-বাছাই এবং সকল মুজতাহিদদের ইজতেহাদের চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু করেন, তবে তিনি নিজেকে এমন এক অর্থ সমুদ্রে নিক্ষেপ করবেন, জীবনভর চেষ্টা করেও যা অতিক্রম করা সম্ভব হবে না এবং সম্ভবত জীবনেও কূল কিনারায় পৌঁছাতে পারবেন না। ... এই অসংখ্য

জিনিসের জ্ঞানলাভ করতে করতে যখন তিনি জীবন সায়াহ্নে এসে পৌঁছবেন তখন আরো জরুরি ও প্রাসঙ্গিক মাসলা-মাসায়েল উদ্ভাবন করার কাজে আত্মনিয়োগ করা তার পক্ষে কেমন করে সম্ভব হতে পারে? আর মানুষ যত মেধাবীই হোক না কেন, তার একটা সীমা আছে। এ সীমার বাইরে কিছু করতে সে অক্ষম।”

সুতরাং বোঝা গেল, এই জটিল কঠিন ইসলাম আল্লাহর দেওয়া সিরাতুল মুস্তাকীম ইসলাম হতে পারে না, রসুল্লাহর আনীত এবং উম্মতে মোহাম্মদীর অনুসৃত ইসলাম হতে পারে না। আল্লাহ কোর'আনে বারবার বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন, দীনকে কঠিন করতে নিষেধ করেছেন। তবু সীমাহীন বাড়াবাড়ি করে লক্ষ লক্ষ ফতোয়া নির্গত করা হয়েছে। তিনি বলেছেন,

(১) আল্লাহ তোমাদেরকে কোনো প্রকার কষ্ট দিতে চান না, কোনো প্রকার সংকীর্ণতা চাপিয়ে দিতে চান না বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। (সুরা মায়েদাহ ৬)।

(২) সওমের বিধান বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, “আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না” (সুরা বাকারা ১৮৫)।

(৩) আল্লাহ দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি। (সুরা হজ ৭৮)

সুতরাং বোঝা গেল, আল্লাহর দীনের অন্যতম মূলনীতি হল- এটা পালন করা সহজ, এতে কোনো কঠিনতা, কঠোরতা আরোপ করা হয়নি। এরপরও কেউ যদি মানবিক দুর্বলতাবশত আল্লাহর কোনো হুকুম অমান্য করে ফেলে এবং অনুতপ্ত হয় তিনি সঙ্গে সঙ্গে তা ক্ষমা করে দিবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি কেবল শেরক ছাড়া মো'মেনের সকল পাপ ক্ষমা করে দিবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। মো'মেন যদি আল্লাহর কোনো হুকুমের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে সেটা আন্তরিকতার সাথে পালন করে, আল্লাহ তার ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জনা করে তাকে সে আমলের প্রতিদান ও উপকারিতা অবশ্যই প্রদান করবেন। তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রবল। (আবু হোরায়রাহ রা. থেকে বোখারি: ৩১৯৪)। তাই আমাদের উচিত হবে আল্লাহর অভিপ্রায় অনুযায়ী তাঁর হুকুম পালনের ক্ষেত্রে সহজ-সরল পন্থা অবলম্বন করা ও বেশি বেশি প্রশ্ন করে সহজ বিষয়কে জটিল ও কষ্টসাধ্য না বানিয়ে ফেলা। এ অধ্যায়ে আমরা প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে সওম সংক্রান্ত মৌলিক বিধি-বিধানগুলো জানার চেষ্টা করব।

১. সওম কার জন্য?

উত্তর: আল্লাহ মো'মেনদের উপর সওম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, হে মো'মেনগণ, তোমাদের উপর সিয়াম পালন বিধিবদ্ধ (ফরদ) করা হয়েছে, যেভাবে বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর; যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর (সুরা বাকারা ১৮৩)।

এই মো'মেন কারা? প্রচলিত ধারণা হচ্ছে, যারা একটু বেশি ধার্মিক, একটু বেশি নামাজ রোজা করে তাদেরকে মো'মেন বলা হয়। কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টিতে "শুধু তারাই মো'মেন যারা আল্লাহ ও রসুলের প্রতি ঈমান আনে, অতঃপর তাতে কোনো সন্দেহ করে না এবং জীবন-সম্পদ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ (সর্বাত্মক সংগ্রাম) করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ।" (সুরা হুজরাত ১৫)।

আল্লাহর দেওয়া এ সংজ্ঞায় প্রদত্ত শর্তাবলি পুরণ করে যারা মো'মেন হবে তাদের উপরই সওম পালনের নির্দেশ।

২. সওম পালনকালে কী কী কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে?

উত্তর: কোর'আনে আল্লাহ সওম পালনকালে যে কাজগুলো থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলো থেকে বিরত থাকলেই সওমের হক আদায় হয়ে যাবে। তিনি বলেছেন, "সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে। ...কাজেই এখন তোমরা তাদের সাথে সংগত হও এবং আল্লাহ যা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন তা কামনা কর। আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাতের কালোরেখা থেকে ঊষার সাদা রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রকাশ না হয়। তারপর রাতের আগমন পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। (সুরা বাকারা ১৮৭)।

সুতরাং আল্লাহর হুকুম সুস্পষ্ট। সওম পালন অবস্থায় এ সময় দিনের বেলায় পানাহার ও স্ত্রী-সম্ভোগ করা যাবে না। ব্যাস, এ দুটো কাজ থেকে বিরত থাকাই সওম সঠিক হওয়ার যথেষ্ট। বর্তমানে চুলচেরা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে সওম ভাঙার আরো অনেক কারণ আবিষ্কার করা হয়েছে। সেগুলোকে আল্লাহর বিধান বলা যায় না।

৩. সওমের শুরু ও শেষ সময় কখন?

উত্তর: আল্লাহ বলেছেন, "আর পানাহার কর যতক্ষণ না কাল রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। অতঃপর সওম পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত" (সুরা বাকারা ১৮৭)। এখানে 'রাত পর্যন্ত' বলতে কি সূর্যাস্ত ধরতে হবে, না ঘন অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত ইফতারের জন্য অপেক্ষা করতে হবে- এ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। অধিকাংশ ধর্মবেত্তাই মনে করেন, ফজরের আযান থেকে মাগরিবের আযান পর্যন্ত হচ্ছে দিনের পরিসীমা। এটুকু সময় সওম রাখতে হবে। আমরা মনে করি, সওমের সময় নিয়ে এর থেকে বেশি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই।

৪. অসুস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে সওমের বিধান কী?

উত্তরঃ অসুস্থ ব্যক্তির জন্য সওম পালন বাধ্যতামূলক নয়। অসুস্থতার কারণে কেউ যে কয়টি সওম রাখতে পারবেন না, রমজানের পরে সুস্থ হলে তিনি সে কয়টি সওম রেখে দিবেন (সুরা বাকারা ১৮৪-১৮৫)। কিন্তু তিনি যদি এতটাই অসুস্থ হন যে পরেও রাখতে পারবেন না বলে মনে করেন, সেক্ষেত্রে তিনি প্রতিটি সওমের বদলে একজন মিসকিনকে খাদ্যদান করবেন। (সুরা বাকারা ১৮৪)।

৫. যার জন্য সওম রাখা খুবই কষ্টকর তার ক্ষেত্রে কী করণীয়?

উত্তরঃ সওম রাখা যার জন্য খুবই কষ্টদায়ক সে প্রতিটি সওমের বদলে একজন মিসকিনকে খাদ্য দান করবে। আল্লাহ মানুষকে কষ্ট দিতে চান না, তাই তিনি এই সুযোগটি রেখেছেন। তবে এটাও বলেছেন, যে ব্যক্তি খুশির সাথে সৎকর্ম করে, তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি সওম রাখ, তবে তোমাদের জন্যে বিশেষ কল্যাণকর, যদি তোমরা তা বুঝতে পার। (সুরা বাকারা ১৮৪)

কারো জন্য যদি সওম পালন খুবই কঠিন হয়ে পড়ে এবং পানাহার আবশ্যক হয়, তবে পানাহার বাধ্যতামূলক। কেননা, আল্লাহ তায়ালা যেমন কারও ওপর বিধান চাপিয়ে দেন না, তেমনি নিজের ওপর জবরদস্তিমূলক কোনো বিধান বানিয়ে নেয়াও বৈধ নয়। কঠিন অবস্থায় সওম পালনকারীকে লক্ষ্য করে রসুল (সা.) বলেছিলেনঃ এরা পাপী, এরা পাপী। (মুসলিম, হাদিস ১১১৪)

৬. বিনা কারণে সওম ভাঙলে কাফফারা কী?

উত্তরঃ বিনা কারণে সওম ভাঙা তাকওয়ার পরিপন্থী। তারপরও কেউ যদি ভাঙে তাহলে তার উচিত হবে পরবর্তীতে সম-সংখ্যক সওম রাখা এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

৭. সেহরি খাওয়া বাধ্যতামূলক কিনা?

উত্তরঃ সেহরি খাওয়া বাধ্যতামূলক নয়। সেহরি না খেলেও সওম হবে।

৮. সেহরি খাওয়ার সঠিক সময় কখন?

উত্তরঃ সেহরি খাওয়ার সময় শুরু হয় মধ্যরাত থেকে। আর শেষ হয় ফজরের আগে। এর মাঝে সেহরি খেলেই চলবে।

৯. তারাবির নামাজ সওমের অংশ কিনা?

উত্তরঃ তারাবির নামাজ সওমের অংশ নয়। তারাবির নামাজ ঐচ্ছিক, কেউ চাইলে করতে পারে। তবে এর সাথে সওমের কোনো সম্পর্ক নেই।

১০. রমজান মাসে ফেতরা দেওয়া কাদের জন্য বাধ্যতামূলক?

উত্তরঃ ইবনে ওমর বলেন, রসুলাল্লাহ স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, নারী ও পুরুষ, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা’ পরিমাণ খেজুর বা যব জাকাতুল ফিৎর (ফেতরা) হিসাবে ওয়াজিব করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশে বের হওয়ার পূর্বেই আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন’। (বোখারি, মুসলিম, আহমদ)। সুতরাং মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত যে কোনো ব্যক্তির জন্য ফেতরা প্রদান করা বাধ্যতামূলক। ফকিহদের মতে, যার ঘরে ঈদের রাত ও দিনে একান্ত প্রয়োজনীয় এবং নিজের ও পরিবারের খাবারের অতিরিক্ত খাদ্য মজুদ থাকে, তাকেই ফেতরা প্রদান করতে হবে।

১১. ফেতরার পরিমাণ কত?

উত্তরঃ ফিতর বা ফাতুর বলতে সকালের খাদ্যদ্রব্য বোঝানো হয় যা দ্বারা সওম পালনকারীগণ সওম ভঙ্গ করেন (আল মুজাম আল ওয়াসিত, পৃষ্ঠা ৬৯৪)। এর তাৎপর্য হচ্ছে, ঈদের দিন একটি খুশির দিন। এই দিন সকালে অন্তত যেন কেউ অভুক্ত না থাকে, সবাই যেন সকালে কিছু খেতে পায় সেটা নিশ্চিত করার জন ফেতরার ব্যবস্থা। একজন ব্যক্তির আহারের জন্য মোটামুটি কত টাকার খাদ্য প্রয়োজন পড়ে তা বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষ একটি ন্যূনতম অর্থ ফেতরা হিসাবে ধার্য করবেন। তবে এর বেশি যে যত খুশি ফেতরা হিসাবে দান করতে পারে।

১২. সৌদির সঙ্গে মিল রেখে ঈদ করা কি শরিয়তসম্মত?

উত্তরঃ এটা শরিয়তসম্মত নয়। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে সৌদি আরবের টাইম জোন (GMT+3) আমাদের দেশের (GMT+6) থেকে তিন ঘণ্টা কম। সেখানে সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত আমাদের দেশের তিন ঘণ্টা পরে হয়। আমরা কি সৌদি আরবের সাথে মিলিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত সালাহ আদায় করতে পারি? পারি না। আমরা সালাহ করি আমাদের দেশের সময় অনুযায়ী। একইভাবে সওম ও ঈদও আমাদের দেশের সময় অনুযায়ী পালন করতে হবে। আমাদের দেশেই বিভিন্ন অঞ্চলে ইফতারের সময়ে কিছুটা তারতম্য হয়। এটা ভৌগোলিক বাস্তবতা। তাছাড়া সওম, ঈদ এগুলো সামষ্টিক আমল। বিচ্ছিন্নভাবে এগুলো করা শরিয়তসম্মত নয়। আল্লাহ বা আল্লাহর রসুল কোথাও বলেননি যে, তোমরা সৌদি আরবের সময়ের সাথে মিলিয়ে সমস্ত আমল করবে। বরং তিনি বলেছেন, ‘চাঁদ না দেখা পর্যন্ত তোমরা সিয়াম (রোজা) পালন করবে না, অনুরূপভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত নতুন চাঁদ না দেখবে, তোমরা ঈদ পালন করবে না।’ (মুয়াত্তা মালিক, হাদিস : ৬৩৫)। সুতরাং যখন যে অঞ্চলে চাঁদ দেখা যাবে তখন সে অঞ্চলে সওম বা ঈদ পালন করতে হবে।

পৃথিবীর আহ্নিক গতির কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে চাঁদ ও সূর্য ওঠার ভিন্ন ভিন্ন ও নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। পৃথক স্থানে সূর্য ও চাঁদের উদয় অস্তের সময় অংক করে

বের করা যায়। তাই চাঁদ দেখা কমিটির দূরবীন নিয়ে বসে থাকার দরকার হয় না। গ্রীক সভ্যতার হেলেনিস্টিক যুগেও জ্যোতির্বিদগণ চাঁদ সূর্য গ্রহ নক্ষত্রের গতি নির্ণয়ের যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছিলেন (সম্ভাব্য সময় ১৫০ খ্রি.পূর্ব)। অষ্টম শতাব্দীতে মুসলিমদের সোনালি যুগে জ্যোতির্বিদ মোহাম্মদ আল ফারাজি জ্যোতিষ্কের গতিপথ, দিকনির্ণয় ও সময় জানার জন্য অ্যাস্ট্রোলেইব (Astrolabe) উদ্ভাবন করেছিলেন যা সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত। তখন থেকেই চাঁদ-সূর্যের অবস্থান জানার জন্য দূরবীন নিয়ে বসে থাকার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। রসুলাল্লাহর সময় খেজুর গাছের উপরে উঠে লোকেরা বসে থাকত চাঁদ দেখার জন্য, আকাশে মেঘ থাকলে আর চাঁদ দেখা সম্ভব হত না। আমাদের মুসলিম পণ্ডিতরা এখনও সেই যুগেই পড়ে থাকতে চান। তাই মুসলিম বিশ্বে এখনও চাঁদ দেখা কমিটি এখনও উঁচু বাড়ির ছাদে দূরবীন নিয়ে বসে থাকে।

১৩. ঈদুল ফিতরের নামাজ বাধ্যতামূলক কিনা?

উত্তরঃ ঈদের নামাজ বাধ্যতামূলক বা ফরজ নয়। এটি একটি সামষ্টিক আমল। জাতির এমাম বা তাঁর প্রতিনিধিরা সেখানে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে খোতবা দিবেন। তাই যারা ঈদের জামাতে উপস্থিত থাকবেন তারা উপকৃত হবেন। এজন্য ঈদসহ যে কোনো সামষ্টিক জামায়াতে উম্মাহর নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি সদস্যের উপস্থিতি কাম্য। কিন্তু তা বাধ্যতামূলক নয়।

এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, রসুলাল্লাহর মক্কী জীবনে যখন আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সে সময় রমজানের সওম বা ঈদের বিধানও নাজিল হয়নি। তখন যারা ইসলাম কবুল করেছেন তাদের উপর কাফেররা নির্মম অত্যাচার নির্যাতন চালাচ্ছিল। তাদের কোনো স্বাধীন ভূখণ্ড ছিল না, সার্বভৌমত্ব ছিল না। এমন পরিবেশে ঈদ অর্থাৎ আনন্দ-উৎসব সম্ভব হয় না। করলেও তার কোনো কোনো মূল্য থাকে না।

একইভাবে বর্তমানেও পৃথিবীর কোথাও আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত নেই। মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে চলছে নির্মম নির্যাতন নিপীড়ন। তাদের একটার পর একটা দেশ ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছে, গণহত্যা চালানো হচ্ছে। আট কোটি মুসলিম উদ্বাস্তু হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। অন্যান্য দেশের মুসলিমদের এখন আনন্দ বা ঈদ উদযাপনই বা কী করে শরিয়াহসম্মত হতে পারে? এখন মুসলিমদের উচিত নিজেদের মধ্যকার সকল ফেরকা মাজহাব, বিভিন্ন জাতীয়তার বিভাজন ছুঁড়ে ফেলে একক জাতিসত্তা গড়ে তোলা এবং পাশ্চাত্যের বিধান পরিহার করে আগে আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

১৪. সফরের মাত্রা কতটুকু হলে মুসাফির হিসাবে গণ্য হবে?

উত্তর: দূরবর্তী কোনো স্থানে গমনের জন্য নিজ আবাসস্থল থেকে যাত্রা শুরু করাকে সফর বলে। রসুলাল্লাহ সফরের দূরত্বের কোনো সীমারেখা নির্ধারণ করে দেননি। সাহাবিগণও কোনো সীমারেখার কথা বলেননি। তাঁরা সাধারণভাবে 'সফর' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট দূরত্ব বোঝান নি। তবে ফকিহদের মতে যদি কোন ব্যক্তি মোটামুটি ৪৮ মাইল (৭৭.২৩২ কিলোমিটার) রাস্তা অতিক্রম করে কোন স্থানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে নিজ এলাকার লোকালয় থেকে বের হয়, তাকে ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় সফর বলা হয়, আর সফরকারীকে বলা হয় মুসাফির।

রসুলাল্লাহ তাঁর রিসালাতকালে বিভিন্ন উদ্দেশে সফর করেছেন যেমন, হিজরতের সফর, আল্লাহর পথে জেহাদের সফর, ওমরা ও হজের সফর ইত্যাদি। তবে তিনি আল্লাহর পথে জেহাদের জন্য সবচেয়ে বেশি সফর করেছেন। আরবের উত্তপ্ত মরুভূমির উপর দিয়ে তাঁরা যখন কোনো গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য যাত্রা করতেন তখন তাদেরকে দিনের পর দিন খোলা আকাশের নিচেই রাত কাটাতে হত। এখনকার মত দ্রুতগ্রামী যানবাহন তখন ছিল না। পথও ছিল দুর্গম। তাই মুসাফির অবস্থায় সওম রাখা তাদের জন্য ছিল কষ্টসাধ্য। বর্তমান সময়েও যদি কেউ দূরবর্তী গন্তব্যে ভ্রমণকালে তার কাছে সওম পালন কষ্টকর বোধ হয়, তবে তিনি সওম ভাঙতে পারেন, কিন্তু পরে তাকে সম-সংখ্যক সওম রাখতে হবে।

১৫. শুধু রমজান মাসে জাকাত দানের নিয়ম শরিয়াহসম্মত কিনা?

উত্তর: জাকাত দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময়ের বাধ্যবাধকতা শরিয়তে নেই। শুধু রমজান মাসে জাকাত দিতে হবে এমন কোনো কথাও নেই। বছরের যে কোনো সময় নেসাব পূরণ সাপেক্ষে তা আদায় করা যায়। তবে রমজান মাসে দান বা সাদকা প্রদানের জন্য আল্লাহর রসুল বিশেষভাবে উৎসাহিত করতেন। এতে করে বিত্তশালীদের হৃদয় ও সম্পদ পবিত্র হয়, দরিদ্রদের দারিদ্র্য দূর হয়, সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য আসে। রমজান মাসের বাধ্যতামূলক দান হচ্ছে ফেতরা যাকে শরিয়তের পরিভাষায় জাকাত আল ফিতর বলা হয়ে থাকে।

১৬. দুগ্ধপোষ্য সন্তান থাকলে মায়ের জন্য সওম ফরজ কিনা?

উত্তর: আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসুল বলেছেন, আল্লাহ মুসাফিরের অর্ধেক সালাত ও সওম মাফ করে দিয়েছেন আর অন্তঃসত্ত্বা ও স্তন্যদানকারিণী নারীদের জন্য সওম মাফ করে দিয়েছেন। (সুনানে তিরমিজি: ৭১৫, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৬৬৭)।

গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মায়েদের জন্য সওম রাখা কষ্টকর হলে সওম ভাঙা বৈধ। সওম রাখলে তার নিজের স্বাস্থ্য অথবা সন্তানের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হওয়ার আশংকা করলে সওম না-রাখা বৈধ তো বটেই বরং এ অবস্থায় সওম না-রাখাই উত্তম; অনেক আলেম বলেছেন, দুধের শিশু বা গর্ভের সন্তানের স্বাস্থ্যের গুরুতর ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকলে সওম ছেড়ে দেয়া ফরজ; সওম রাখা হারাম।

১৭. মুমূর্ষু রোগীকে রক্ত দিলে বা নিজে রক্ত নিলে সওম ভাঙবে কিনা?

উত্তরঃ দীনের উদ্দেশ্য মানুষের কল্যাণ সাধন। সুতরাং একজন মুমূর্ষু রোগীকে রক্ত দেওয়া একটি উত্তম আমল। রক্ত দেওয়ার কারণে যদি রক্তদাতার দুর্বলতা অনুভব হয়, তার উচিত হবে সওম ভেঙে ফেলা এবং পরবর্তীতে সেই সওমটি পালন করা।

আর রক্ত নিলে সওম ভাঙবে কিনা এ প্রশ্ন অবান্তর। আল্লাহ অসুস্থদেরকে সওম রাখার ক্ষেত্রে ছাড় দিয়েছেন। যিনি এতটাই অসুস্থ যে রক্ত নেওয়ার প্রয়োজন পড়ছে, তিনি সওম রাখবেন কেন?

১৮. জেহাদরত অবস্থায় বা শত্রুর এলাকায় সওম পালন জায়েজ কিনা?

উত্তরঃ জেহাদরত অবস্থায় সওম পালন জায়েজ নয়। কারণ জেহাদে সর্বোচ্চ শারীরিক সক্ষমতা, শক্তি ও সামর্থ্যের প্রয়োজন পড়ে। জেহাদের সফরে যদি কঠিন শত্রুর মুখোমুখী হতে হয় এবং শক্তিমত্তা প্রদর্শনের বিকল্প না থাকে, যখন সওম রাখলে দুর্বল হয়ে পড়ার সমূহ আশঙ্কা থাকে, তখন সওম রাখা কিছুতেই সঙ্গত নয়। অনেক আলেম বলেছেনঃ এ-সময় সওম পালন হারাম। এ বিষয়ে আল্লাহর রসুলের জীবন থেকে বহু উদাহরণ হাদিসগ্রন্থে পাওয়া যায়। উমর বিন খাত্তাব (রা.) বলেনঃ "আমরা রসুলের সাথে রমজান মাসে দুটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছি- বদর ও মক্কা বিজয়। এ উভয় যুদ্ধে আমরা পানাহার করেছি" (তিরমিজিঃ ৭১৪)।

বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গে সাহাবায়ে কেরাম বর্ণনা করেন, আমরা সওম রেখেই রওনা হয়েছিলাম। চলতে চলতে যখন শত্রু বাহিনীর একেবারে কাছে পৌঁছলাম, তখন আল্লাহর রসুল আমাদের সওম না রাখার আদেশ দিলেন। তিনি নিজেও সওম রাখলেন না। আরেক জেহাদ প্রসঙ্গে সাহাবায়ে কেরাম বলেন, আমরা সওম রেখেই রওনা হলাম। কয়েকদিনের সফর শেষে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ অবসন্ন হয়ে পড়ল। এ খবর আল্লাহর রসুলের কাছে গেলে তিনি সওম ভেঙে ফেললেন এবং সবাইকে সওম ভেঙে ফেলার আদেশ করলেন। এরপরও কেউ কেউ দিনটি শেষ করতে চাইলেন। মহানবী (সা.) এতে অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করলেন।

আবু সাইদ খুদরি (রা.) বলেনঃ সওম পালনরত অবস্থায় আমরা রসুলাল্লাহর সঙ্গে মক্কায় সফরে বের হলাম। এক স্থানে যাত্রা বিরতিকালে রসুলাল্লাহ বললেনঃ তোমরা শত্রুব্যূহের কাছাকাছি পৌঁছে গেছ, পানাহার তোমাদেরকে শারীরিকভাবে সবল করে

তুলবে। সুতরাং আমাদের রুখসত অর্থাৎ ছাড় প্রদান করা হয়েছিল। আমাদের কেউ সওম রেখেছিল, পানাহার করেছিল কেউ কেউ। অতঃপর ভিন্ন এক স্থানে উপনীত হলে রসুলাল্লাহ আমাদেরকে বললেন: তোমরা ভোরে শত্রুর মুখোমুখী হবে, পানাহার হবে তোমাদের জন্য বলদায়ক, সুতরাং, তোমরা পানাহার করো। পানাহার ছিল বাধ্যতামূলক। তাই আমরা সকলে পানাহার করলাম (মুসলিম, হাদিস ১১২০)।

একইভাবে আল্লাহর দীন প্রচারের কাজ করা বা সফর করাও জেহাদেরই অংশ। তাই দাওয়াতি কাজসহ জেহাদের সঙ্গে সংশিষ্ট যেকোনো শ্রমসাধ্য কাজের সময় সওম রাখা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ালে সওম ভেঙে ফেলার অনুমতি রয়েছে। কোনো অবস্থাতেই দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বাধাগ্রস্ত হয়, জেহাদের জন্য অসুবিধা সৃষ্টি হয় এমন কিছু করার সুযোগ ইসলামে নেই।

ইসলামে ঈমানের পরে সবচেয়ে জরুরি ও ফজিলতপূর্ণ আমল হচ্ছে জেহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। তাই যুদ্ধাবস্থায় সালাত, সওম ইত্যাদি আমল স্থগিত রাখাটা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সালাহ, সওম এগুলো হচ্ছে মো'মেনের চারিত্রিক প্রশিক্ষণ। মো'মেন যেন আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতে পারে, সংগ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও দৃঢ়তা তাদের মধ্যে তৈরি হয়, এজন্যই সালাহ সওম ইত্যাদি আমলকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যখন জেহাদের পরিস্থিতি উপস্থিত, তখনও মূল কাজ বাদ দিয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়া নির্বুদ্ধিতা- তা সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায়।

সওম শরীরের জাকাত

সওমের মাধ্যমে যেমন আত্ম-নিয়ন্ত্রণের শক্তি অর্জিত হয়, তেমনি এর শারীরিক উপকারিতাও প্রচুর। শারীরিক সুস্থতার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পানাহার থেকে বিরত থাকা, উপবাস বা Fasting একটি কার্যকর মাধ্যম। আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন, প্রত্যেক জিনিসের জাকাত আছে, আর শরীরের জাকাত হল সওম।' (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস ১৭৪৫)। এছাড়া সওমের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যগত উপকারিতা সম্পর্কে চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি।

বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে উপবাস বা Fasting এর পক্ষে নিজেদের মতামত প্রকাশ করে বলেছেন, যদি সুস্থ থাকতে চাও তাহলে রোজা রাখো। যেমন ড. আলেগ হিগই বলেছেন- "রোজা রাখার ফলে মানসিক শক্তি এবং বিশেষ বিশেষ অনুভূতিগুলো উপকৃত হয়। স্মরণশক্তি বাড়ে, মনোসংযোগ ও যুক্তিশক্তি পরিবর্ধিত হয়। প্রীতি, ভালোবাসা, সহানুভূতি, অতীন্দ্রিয় এবং আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ ঘটে। ঘ্রাণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি প্রভৃতি বেড়ে যায়। এটা খাদ্যে

অরুচি ও অনিচ্ছা দূর করে। রোজা শরীরের রক্তের প্রধান পরিশোধক। রক্তের পরিশোধন এবং বিশুদ্ধি সাধন দ্বারা দেহ প্রকৃতপক্ষে জীবনীশক্তি লাভ করে। যারা রুগ্ন তাদেরকেও আমি রোজা পালন করতে বলি।”

সওম বা রোজার মাধ্যমে আত্মার পরিশুদ্ধতা ছাড়াও বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত অনেক স্বাস্থ্যগত উপকারিতা রয়েছে। জাপানের বিজ্ঞানী ইউশিনোরি ওহসোমি উপবাসের উপকারিতা গবেষণার মাধ্যম প্রমাণ করে ২০১৬ সনে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি আবিষ্কার করেন যে ১২-২৪ ঘণ্টা উপবাস থাকলে মানুষের দেহে অটোফেজি চালু হয়। Autophagy কি ? Autophagy শব্দটি একটি গ্রিক শব্দ। Auto অর্থ নিজে নিজে এবং Phagy অর্থ খাওয়া। সুতরাং, অটোফেজি মানে নিজে নিজেকে খাওয়া। শরীরের কোষগুলো বাইরে থেকে কোনো খাবার না পেয়ে, নিজেই যখন নিজের অসুস্থ কোষগুলো খেতে শুরু করে, তখন মেডিক্যাল সাইন্সের ভাষায় তাকেই অটোফেজি বলা হয়।

একটু ব্যাখ্যা করে বললে, মানুষের সারা শরীর ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন কোষ দিয়ে গঠিত। এই কোষগুলো কিছুটা কারখানার মতো। এখানে সারা দিন কাজ চলছে, কিছু আবর্জনা তৈরি হচ্ছে, কিছু যন্ত্রপাতি ভেঙে যাচ্ছে, কিছু মেশিন নষ্ট হচ্ছে। সেগুলো মেরামতের প্রয়োজন হয়। এই কাজটা কোষ নিজেই করে অটোফেজি নামক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। অকার্যকর ও ক্ষতিকর বিষয়গুলো রিসাইকেল করে তা আবার ব্যবহারের যোগ্য করে তোলে, কোষকে সতেজ হতে সাহায্য করে এবং শরীরে তারুণ্য ধরে রাখতে সহযোগিতা করে। এই প্রক্রিয়া যথাযথভাবে না হলে ব্রেনের বিভিন্ন রোগ যেমন অলঝেইমার্স (বার্ধক্যজনিত স্মৃতিভ্রংশ) হতে পারে। মানুষ যদি সারাক্ষণ খাওয়ার মধ্যে থাকে, তখন অটোফেজি প্রক্রিয়া দমে থাকে। অন্যদিকে সওম অবস্থায় অটোফেজি প্রক্রিয়া বেড়ে যায়। (প্রবন্ধঃ Autophagy in healthy aging and disease)

সওম পালন আমাদের পাকস্থলীকে বিশ্রাম দেয় ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে। সওম রাখার কারণে সারাদিন কোন খাবার খেতে হয় না, তাই এর মাধ্যমে বিশ্রাম নিয়ে পাকস্থলী ইফতারের পর পুনরায় হজম ক্রিয়া শুরু করে।

মানবদেহের পরিপাকতন্ত্রে অনেক উপকারী জীবাণু বসবাস করে, যেগুলো দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করাসহ আরো অনেকভাবে স্বাস্থ্যের উপকার করে। না খেয়ে থাকলে শরীরে উপকারী জীবাণুর সংখ্যা বাড়ে।

সওমের আগে ও সওমের পরে সহস্রাধিক ব্যক্তির রক্তচাপ পরীক্ষা করে গবেষকগণ জানিয়েছেন যে, সওম উচ্চ রক্তচাপ কমায়। সওম রাখার ফলে আমাদের শরীরের বিদ্যমান সঞ্চিত ফ্যাট বা চর্বি ভেঙে শরীরকে শক্তি সরবরাহ করে। পাশাপাশি তা রক্তের কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতেও সাহায্য করে। ফলে আমাদের স্ট্রোক

ও হার্টের রোগ হওয়ার ঝুঁকি কম থাকে। বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের করা ৩৫টি গবেষণা একত্র করে দেখা গেছে রমজানের রোজার পর সবার গড়ে এক থেকে দেড় কেজি ওজন কমে। এভাবে সওম আমাদের অতিরিক্ত ওজন কমিয়ে স্থূলতার হাত থেকে রক্ষা করে। আর স্থূলতা বহু রোগের জনক।

সওম পালন রক্তের শর্করা কমাতে সাহায্য করে। দিনের বেলায় Pancreas বা অগ্নাশয় বিশ্রাম গ্রহণ করে ফলে ইফতারের পর পুনরায় ইনসুলিন হরমোনের নিঃসরণের করে কাজ স্বাভাবিকভাবে শুরু করে। এটি রক্তে সুগারের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে যা ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য উপকারী।

সওম পালন আমাদের অনেক বদ অভ্যাস দূর করতেও সাহায্য করে। যেমন-ধূমপানসহ অন্যান্য নেশা। সওম পালনের মাধ্যমে শারীরিক প্রদাহ, বাত ব্যথা দূর হয়।

তবে সওমের শারীরিক উপকারিতা লাভ করতে হলে ইফতার ও সেহেরি উভয় সময় পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। ইফতারে পানির চাহিদা বেশি থাকে। তাই ইফারের সময় এমন কিছু পানীয় পান করা উচিত যা পিপাসা মেটানোর পাশাপাশি শরীরে শক্তি জোগাবে।

শরবতের কথা এলেই আমরা সবার আগে লেবুচিনির শরবতের কথা ভাবি। কিন্তু ইফতারে সাদা চিনির শরবত না খাওয়াই ভালো। সাদা চিনি কারও জন্যই স্বাস্থ্যকর নয়। চিনির পরিবর্তে গুড় খাওয়া যেতে পারে। শরবত হিসাবে পেঁপে, বেল, তরমুজ, আনারস বা মাল্টার জুস খাওয়া যেতে পারে। ইফতারে কিছু ফল চিবিয়ে খাওয়া উচিত। সারা পৃথিবীতেই ইফতারে খেজুর খাওয়ার প্রচলন রয়েছে। খেজুর উচ্চ ক্যালরি ও ফাইবারযুক্ত ফল। খেজুর শক্তি সরবরাহের পাশাপাশি অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের চাহিদাও পূরণ করবে। খেজুরের পাশাপাশি আপেল, পেয়ারা, নাশপাতি, বরই, তরমুজ ইত্যাদি রাখা যেতে পারে।

ইফতারে জিলাপি, পেঁয়াজু, বেগুনি, চপ, নিমকি, পাকোড়াসহ ডালের বেসনে তৈরি খাবার খেলে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা, কোষ্ঠকাঠিন্য, রক্তে ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যাওয়াসহ অন্য শারীরিক জটিলতা দেখা দিতে পারে। এগুলো একেবারে বাদ দিতে না পারলে দিনে বড়জোর একটা পদ খাওয়া যেতে পারে। তবে মনে করে শিশুদের জন্য আমিষ জাতীয় কোনো খাবার রাখা উচিত।

ইফতারের আয়োজন বাড়ির সব সদস্যের কথা মাথায় রেখে করতে হবে। ছোটদের জন্য একটু প্রোটিনজাতীয় খাবার বেশি রাখা দরকার। বয়স্ক ব্যক্তিদের শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে তাদের জন্য প্রযোজ্য খাবারগুলো রাখার চেষ্টা করতে হবে। যেমন পরিবারে কারও কিডনির সমস্যা থাকলে তার জন্য ডাল বা ডাল দিয়ে

তৈরি ইফতারি ভালো নয়। কারও হয়তো হৃদ্‌রোগ আছে। তার জন্য তৈলাক্ত বা চর্বিযুক্ত খাবার রাখা বর্জনীয়।

আল্লাহ কেবল তাঁর শেষ কেতাবেই সওম পালনের বিধান দেননি। পূর্ববর্তী প্রতিটি ধর্মেও উপবাস ব্রত পালনের বিধান রয়েছে। এর কারণ সওম, রোজা, উপবাস অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় পানাহার থেকে বিরত থাকার স্বাস্থ্যগত উপকারিতা অপরিসীম যা এখন চিকিৎসা বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহর নাজিলকৃত জীবনব্যবস্থার একটি নাম দীনুল ওয়াসাতা বা ভারসাম্যপূর্ণ জীবনবিধান। এই দীনের প্রতিটি বিধানই দেহ-মন, ইহকাল-পরকাল, জাগতিক-আধ্যাত্মিক এই উভয়প্রকার জীবনের ভারসাম্যযুক্ত। সওমের ক্ষেত্রেও তাই। এর দ্বারা দৈহিক, মানসিক, জাগতিক, আধ্যাত্মিক, ইহলৌকিক, পারলৌকিক সকল ক্ষেত্রে কল্যাণ লাভ সম্ভব যার কিছুটা আমরা জানি, অনেক কিছুই জানি না। তাই আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহর সেই উক্তি যেখানে তিনি বলছেন, 'যে ব্যক্তি আনন্দের সাথে সৎকর্ম করে, তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি সওম পালন করো, তবে তা তোমাদের জন্যে বিশেষ কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে।' (সুরা বাকারা ১৮৪)।

রসুলাল্লাহর (সা.) ঈদ কেমন ছিল?

এ ইতিহাস সকলেই জানেন, মক্কার তেরো বছর রসুলাল্লাহ কোনো ঈদ উদযাপন করেন নি, তখন ঈদের হুকুমও আসেনি। স্বভাবতই, কারণ মক্কায় মুসলিমরা ছিলেন নির্যাতিত, মজলুম। সেই বিভীষিকাময় দিনগুলোতে কোনরকম ঈদ-আনন্দ করা সম্ভব ছিল না, যুক্তিসঙ্গতও ছিল না। রসুলাল্লাহ সর্বপ্রথম দ্বিতীয় হিজরীতে মদিনায় আল্লাহর নির্দেশ রমজানের সওম পালন ও ঈদ উদযাপন করেন। কেননা তখন ইসলামের বিজয় পতাকা পতপত করে উড়ছে, মদিনাবাসী রসুলাল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তওহীদের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, একটি ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে হলেও আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আল্লাহর দীন চর্চা হতে শুরু করেছে, দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার বন্ধ হয়েছে। তখন রসুলাল্লাহ প্রথম ঈদ উদযাপন করলেন, আনন্দ করলেন। পরাধীন ও নির্যাতিত জাতির আনন্দ করা সাজে না, আনন্দ করার জন্য স্বাধীন সার্বভৌম জাতিসত্তা প্রয়োজন হয়।

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলাল্লাহ (সা.) যখন মদিনায় আগমন করেন, তখন তাদের দুটি দিন ছিল, যাতে তারা উৎসব পালন করত। তিনি জিজ্ঞেস করেন, এ দুটি কিসের দিন? তারা বলল, আমরা জাহেলি যুগে এ দুই দিন খেলাধুলা ইত্যাদি উৎসব পালন করতাম। এ নিয়মই চলে আসছে। রসুলাল্লাহ (সা.) বলেন, মহান আল্লাহ তোমাদের জন্য এ দুটির পরিবর্তে এর চেয়ে উত্তম দুটি দিন দান করেছেন। তা হল ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ১১৩৬;

মুসনাদ আহমাদ, হাদিস : ১৩৬৪৭)। এভাবেই দ্বিতীয় হিজরী মোতাবেক ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় সর্বপ্রথম ঈদ উদযাপন হয়।

মদিনায় রসুলাল্লাহর ঈদের সারাটা দিনকে পর্যায়ক্রমে সাজালে দেখা যায়, তিনি ঈদের দিন সকালে উঠে গোসল করে সর্বোত্তম পোশাক পরিধান করে সকলকে নিয়ে ঈদগাহে ঈদের সালাত আদায় করতে যেতেন। সালাতের পর রসুলাল্লাহ জাতির উদ্দেশ্যে খুতবা প্রদান করতেন। সেখানে তিনি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতেন। বিষয়গুলো যেন সবাই জানতে পারে সেজন্য ঈদের ময়দানে জাতির সকল সদস্যের অংশগ্রহণ করার জন্য জোর তাগিদ দেওয়া হত। ঈদের খোতবা নিয়ে বিশিষ্ট সাহাবি আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) বলেন, রসুলাল্লাহ (সা.) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহে গমন করে সেখানে তিনি প্রথম যে কাজ শুরু করতেন তা হল সালাত (নামায/নামাজ)। আর সালাত শেষ করে তিনি লোকদের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন এবং তারা তাঁদের কাতারে বসে থাকতেন। তিনি তাদের নসীহত করতেন, উপদেশ দিতেন এবং নির্দেশ দান করতেন। যদি তিনি কোন সেনাদল পাঠাবার ইচ্ছা করতেন, তবে তাদের আলাদা করে নিতেন। অথবা যদি কোন বিষয়ে নির্দেশ জারি করার ইচ্ছা করতেন তবে তা জারি করতেন। তারপর তিনি ফিরে যেতেন। (সহিহ বোখারি, হাদিস নং-৯০৮)।

ঈদগাহে উপস্থিত নারীরাও যেন তাঁর কথা ভালোভাবে বুঝতে পারেন এজন্য তিনি নারীদের কাতারের সামনে এসে আবারও বক্তব্য দিতেন। ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, এক ব্যাক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি রসুলাল্লাহর সঙ্গে কখনো ঈদের মাঠে গমন করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, গিয়েছি। তবে তাঁর কাছে আমার যে মর্যাদা ছিল তা না থাকলে আমি অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে সেখানে যেতে পারতাম না। রসুলাল্লাহ কাসীর ইবনু সালাতের বাড়ির কাছে যে নিশানা ছিল সেখানে আসলেন, সালাতের পরে খুতবা দিলেন। এরপর মহিলাদের নিকট গিয়ে তিনি তাদের উদ্দেশে ভাষণ ও উপদেশ প্রদান করেন। তিনি তাদেরকে দান করতে নির্দেশ দেন। ফলে মহিলারা তাঁদের হাতের আংটি খুলে বিলাল (রা.) এর কাপড়ের মধ্যে ফেলতে লাগলেন। এরপর নবী করিম (সা.) ও বিলাল (রা.) বাড়ি চলে এলেন। (সহিহ বোখারি, হাদিস নং ৮২১)।

গরিব দুঃখীরাও যেন সমানভাবে ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে পারে, পরিবার নিয়ে আনন্দে কাটাতে পারে তাই রমজান মাসে ফেতরা দেওয়ার নির্দেশ ছিল। ঈদের সালাতের পূর্ব পর্যন্ত এই ফেতরা প্রদান করা যেত। আর ঈদুল আজহার দিন ঈদের সালাতের পরই সামর্থ্যবান সাহাবিরা উট-বকরি কোরবানি করতেন। রসুলাল্লাহ নিজেই তাঁর কোরবানির পশু জবেহ করতেন।

রসুলাল্লাহ ঈদের দিন পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজনদের খোঁজ খবর নিতেন। সকলের সুখে দুঃখে পাশে থাকতেন। তাছাড়া ইয়াতিম শিশুদের প্রতি রসুলাল্লাহর ছিল অগাধ স্নেহ ও মমতা। রসুলাল্লাহর সঙ্গে দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করতে গিয়ে

বহু সাহাবি শহীদ হয়েছেন। ঈদের দিনে তিনি সেই শহীদদের সন্তানদের ও তাদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। একটি ঈদের দিন রসুলাল্লাহ (সা.) এমনই এক শিশুকে একাকী দাঁড়িয়ে কাঁদতে দেখেন। তিনি শিশুটিকে নিজের সঙ্গে ঘরে নিয়ে আসলেন আর বললেন, 'তুমি কাঁদবে না। আমি তোমার পিতা আর আয়েশা তোমার মাতা, ফাতেমা তোমার বোন আর হাসান-হোসাইন তোমার খেলার সাথি।'

প্রতিটি উৎসবকেই আনন্দমুখর করে তোলার জন্য অন্যতম অনুষঙ্গ হচ্ছে সংগীত ও খেলাধুলা। তৎকালীন মদিনাও এর ব্যতিক্রম ছিল না। অনেকে মনে করে থাকেন, সংগীত, খেলাধুলা এসব মনে হয় ইসলামে হারাম। অথচ এ ব্যাপারে আল্লাহ বা তার রসুল কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ তো করেনই নাই বরং রসুলাল্লাহ তা উপভোগ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে আয়েশা (রা.) বলেন, "(একদিন আমার ঘরে) আবু বকর (রা.) এলেন তখন আমার নিকট আনসারী দু'টি মেয়ে বু'আস যুদ্ধের দিন আনসারীগণ পরস্পর যা বলেছিলেন সে সম্পর্কে গান গাইছিল। তিনি বলেন, তারা কোন পেশাধারী গায়িকা ছিল না। আবু বকর (রা.) বললেন, আল্লাহর রসুল (সা.) এর ঘরে শয়তানী বাদ্যযন্ত্র। আর এটি ছিল ঈদের দিন। তখন আল্লাহর রসুল (সা.) বললেন, হে আবু বকর! প্রত্যেক জাতির জন্যই আনন্দ উৎসব (ঈদ) রয়েছে আর এ হল আমাদের আনন্দ"। (বোখারি পর্ব ১৩ : /৩ হাঃ ৯৫২, মুসলিম ৮/৪ হাঃ ৮৯২)

আয়েশা (রা.) আরো বলেন, "আর ঈদের দিন সুদানী সাহাবিরা বর্শা ও ঢালের দ্বারা খেলা করত। আমি নিজে (একবার) রসুলাল্লাহকে জিজ্ঞেস করেছিলাম অথবা তিনি নিজেই বলেছিলেন, তুমি কি তাদের খেলা দেখতে চাও? আমি বললাম, হ্যাঁ, অতঃপর তিনি আমাকে তাঁর পিছনে এমনভাবে দাঁড় করিয়ে দিলেন যে, আমার গাল ছিল তাঁর গালের সাথে লাগানো। তিনি তাদের বললেন, তোমরা যা করছিলে তা করতে থাক, হে বনূ আরফিদা। পরিশেষে আমি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, তোমার কি (দেখা) শেষ হয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, তিনি বললেন, তা হলে চলে যাও"। (বোখারি পর্ব ১৩ : /২ হাঃ ৯৪৯, ৯৫০, মুসলিম ৮/৪, হাঃ ৮৯২)

এখানে লক্ষণীয় যে, ঈদের দিন রসুলাল্লাহ একা সঙ্গীত বা খেলাধুলা উপভোগ করেননি, বরং তিনি তাঁর স্ত্রীদেরকেও সঙ্গে রেখেছেন। অথচ বর্তমানে সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রকে হারাম বানিয়ে রাখা হয়েছে, আর খেলাধুলাকে নিরুৎসাহিত করে দীন থেকে একপ্রকার বাদ দেওয়া দেওয়া হয়েছে। রসুলাল্লাহ এমন নিরানন্দ ইসলাম মানুষের উপর চাপিয়ে দেননি। মূলত আল্লাহ হারাম করেছে যাবতীয় অশ্লীলতাকে, যাবতীয় মিথ্যা, আল্লাহর নাফরমানিকে, শেরক ও কুফরকে (সুরা আরাফ ৩৩)। শালীনতার সাথে সকল বিনোদনমূলক কার্যক্রমকে ইসলাম উৎসাহিত করে।

রসুলাল্লাহ ঈদের জামাতেও নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছেন। উম্মু আতিয়্যাহ (রা.) বলেন, "ঈদের দিন আমাদের বের হবার আদেশ দেয়া হত। এমন কি আমরা কুমারী মেয়েদেরকেও অন্দর মহল হতে বের করতাম এবং ঋতুবতী মেয়েদেরকেও। তারা পুরুষদের পিছনে থাকত এবং তাদের তাকবীরের সাথে তাকবীর বলতো এবং তাদের দু'আর সাথে দু'আ করত- সে দিনের বরকত এবং পবিত্রতা তারা আশা করত।" (সহীহ বোখারি)

তিনি আরো বলেন, "দুই ঈদের দিনে ঋতুবতী ও পর্দানশীন মহিলাদেরকে মুসলিমদের জামা'আতে ও দু'আয় অংশ নিতে বের করে নেবার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হল। তবে ঋতুবতীগণ যেন সালাতের জায়গা হতে সরে বসেন। একজন মহিলা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমাদের কারো কারো ওড়না নেই। তিনি বললেন, তাঁর সাথী-বান্ধবী তাঁকে আপন ওড়না প্রদান করবে। (বোখারি, মুসলিম)।

অর্থাৎ এই দুইটি হাদিস থেকেও এটাই স্পষ্ট হয় যে, রসুলাল্লাহ প্রতিটি সামাজিক ও জাতীয় কার্যক্রমে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছেন। নারীদের শরয়ী ওজর থাকলেও তিনি কোন জাতীয় কার্যক্রম থেকে তাদের অংশগ্রহণকে বিরত রাখেন নাই। অথচ আজকে আমাদের এক শ্রেণির আলেম কিসের ভিত্তিতে নারীদেরকে গৃহবন্দী করে রাখতে চায়, তারা মসজিদের সাইনবোর্ডে টানিয়ে দেয়, **"মসজিদে নারীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ"**।

এখন দেখি আমাদের সমাজে ঈদের চিত্রঃ

বর্তমান ঈদ আমাদের সমাজে শুধু একটি বিশেষ শ্রেণির জন্যই আনন্দের সুযোগ নিয়ে আসে। তারা হচ্ছে অর্থশালী শ্রেণিটি। তাদের সেই অর্থের উৎস কী, সেটা হালাল না হারাম সে প্রশ্নও কেউ করে না। অন্যদিকে সমাজের অধিকাংশ মানুষ বছরের বাকি দিনগুলোর মতই নিরানন্দে দিন কাটায়। ঈদের দিনটা যেন তাদের কাছে একটি বাড়তি বোঝা। এই মাসে তাদের অতিরিক্ত উপার্জন না থাকলেও ব্যয় করতে হয় বহুগুণ বেশি। ঈদের খরচ, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে তাদের কপালে দেখা যায় দুশ্চিন্তার বলিরেখা। বর্তমানে আমাদের ঈদগুলোও হয়ে গেছে লোক দেখানো। কেউ কোরবানি করছে খাওয়ার জন্য, কেউ বা প্রথা পালনের জন্য, কেউ করছে নিজের সম্পদ প্রদর্শনের জন্য। যে সমাজে অন্যায় অবিচার হত্যা গুম রাহাজানি দুর্নীতি, ধর্ষণ প্রতিনিয়ত ধাঁই ধাঁই করে বেড়ে চলেছে সেই সমাজে ঈদ পালন কোনো তাৎপর্য বহন করে কি? রসুলাল্লাহ কখন ও কেন ঈদ করেছেন সেটা কেউ ভেবে দেখছেন না।

আগেই বলে এসেছি যে, যখন মদিনায় আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা হল, রসুল্লাহর হাতে খেলাফত আসলো তখন তিনি ঈদ উদযাপন করলেন। আর আজ মুসলিম জাতি সংখ্যায় ২০০ কোটি হয়েও অন্য জাতির গোলাম, পদানত দাস হয়ে বেঁচে আছে। ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়া, আফগানিস্তান, ইয়েমেন, ফিলিস্তিন, মায়ানমারসহ একের পর এক দেশ ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে মুসলমানদের। শতাব্দির পর শতাব্দি তারা

অন্য জাতির মার খেয়ে, অপমানিত, লাঞ্ছিত হয়ে তাদের নারীরা ধর্ষিত হয়ে, আট কোটি উদ্বাস্তু হয়ে টিকে আছে। পরাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলো তাদের একটি পর একটি ভূখণ্ড কেড়ে নিচ্ছে, বোমার আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করে দিচ্ছে তাদের শিশু সন্তানদের, তাদের পরিবারগুলোকে সাগরে ভাসিয়ে দিচ্ছে, বাঁচার তাগিদে ইউরোপের রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করতে হচ্ছে। এদিকে জাতির আলেম, ফকিহ, পণ্ডিতরা দীনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে করে জাতির ঐক্য টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। এরকম একটা পরিস্থিতিতে ঈদ উদযাপন কতটা যুক্তিসঙ্গত ও সময়োপযোগী? ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠী ঈদকে ব্যবহার করে অর্থ রুজি করে যাচ্ছে, তাই মুসলিম জনগোষ্ঠীর পরিস্থিতি নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। ঈদ বেঁচে থাকলে তাদের অর্থনীতি সচল থাকে।

আজ মুসলিম জাতি সম্মিলিতভাবে আল্লাহর দেওয়া হুকুমকে প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের তৈরি জীবনব্যবস্থা দিয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সামষ্টিক, রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবন পরিচালনা করছে। তারা ব্যক্তিগত ধর্ম কর্ম হিসেবে নামাজ রোজা, হজ, জাকাতসহ বহু আমল করে যাচ্ছে আর সার্বিক জীবনে ইলাহ অর্থাৎ হুকুমদাতা হিসেবে মানছে পাশ্চাত্য বস্তুবাদী সভ্যতাকে। আল্লাহও তাঁর পূর্বঘোষণা মোতাবেক মুসলিম জাতিকে অন্য জাতির গোলামে, পদানত দাসে পরিণত করেছেন। তিনি বলেছিলেন, "যদি তোমরা আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রামে বের না হও তাহলে তিনি তোমাদের কঠিন শাস্তি দিবেন এবং তোমাদের উপরে অন্য জাতি চাপিয়ে দেবেন (সুরা তওবা ৩৯)।"

তাই বলা যায়, এখন মুসলিম জাতির ঈদ পালন বা আনন্দ করার সময় নয়। এখন তাদের প্রথম কর্তব্য হল তওহীদের উপর অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ- আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুম মানি না এই কথার উপর ইস্পাতকঠিনভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং তারপর পেটে পাথর বেঁধে, দাঁতে দাঁত চেপে, খেয়ে না খেয়ে দুনিয়াব্যাপী চলমান জুলুম অত্যাচার দূর করে আল্লাহর দীন সামগ্রিক জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করা। তাহলে তারা হবে মো'মেন। এই মো'মেনের চরিত্র তৈরি করবে সালাহ ও সওম। মো'মেন জাতির ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ফলে আল্লাহ তাদের হারানো গৌরব ফিরিয়ে দিবেন। তখন মুসলিম জাতির জন্য ঈদের আনন্দ করা হবে যুক্তিসঙ্গত।

***

পরিশেষে কথা হচ্ছে, এ পুস্তিকায় সওমের প্রকৃত আকিদা, উদ্দেশ্য তুলে ধরতে যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম, পারলাম কিনা জানি না। আমি যে কথাটি বোঝাতে চেয়েছি তা হল, সওম হচ্ছে এমন একটি আমল যা ব্যক্তিকে আল্লাহর হুকুম মানার জন্য আত্মিক, মানসিক ও শারীরিকভাবে প্রস্তুত করে। সওমের দ্বারা যে আল্লাহর হুকুম মান্য করা শিখবে না, তার সওম রাখা না রাখা সমান কথা। সমগ্র মুসলিম বিশ্বে আজ এটাই হচ্ছে।